ইসলামী উপন্যাস

জান্নাতী দুনিয়ার

অসম প্রেম

শায়েখ আব্দুল্লাহ আল মুনীর

প্রথম প্রকাশ:

সফর-১৪৪০ হিজরী

অক্টোবর-২০১৮ ইংরেজী

প্রিন্টিং ও বাঁধাই

মুসলিম প্রিন্টার্স

দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।

মোবাঃ ০১৯৩১-৪৪১২১৪

bestkitab.weebly.com

almunirabdullah@gmail.com

মূল্যঃ ৭৫ টাকা।

এক.

ইমাম সাহেব বিড়বিড় করে কিসব দোয়া-দোরুদ পড়ে ছেলেটায় গায়ে মাথায় ফুঁ দিতে লাগলেন। প্রতিবারে তার মুখ থেকে প্রচুর পরিমাণে বাতাস এবং তার সাথে সবে মাত্র খেয়ে শেষ করা পানের পিক ও সুপারীর চূর্ণ ঝড়ের বেগে ধেয়ে এসে আঘাত করছিলো মজিদের গায়ে। বিকট একটা গন্ধও পাচ্ছিলো মজিদ। সেটা যে জর্দার গন্ধ তা বলাই বাহুল্য। পাশেই মজিদের বাহু চেপে শক্ত করে ধরে বসে আছে তার বাবা। চোখে-মুখে তার বিরক্তি আর ক্ষোভের ভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। ভাবে-সাবে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে মজিদকে এখানে জোর করে ধরে এনে ঝাড়ফুঁক দেওয়া হচ্ছে। তার দুই বাহু আর গলায় ঝুলন্ত ছোট বড় বিভিন্ন আকৃতির তাবিজগুলো প্রমাণ করছে মোল্লা-মৌলোভী বা কবিরাজের কাছে যাওয়া আসা তার এই প্রথম নয়। এতসব ঝাড়ফুঁক আর তাবীজ-তুমারের উদ্দেশ্য হলো, তাকে সুস্থ করে তোলা। মজিদের বাবার ধারনা, সে পাগল হয়ে গেছে অথবা তাকে ভূতে ধরেছে। সারাদিন উদাস মনে বসে থাকে, কারো সাথে কোনো কথা বলে না, কেউ যেচে কথা বলতে গেলেই বানরের মতো মুখ ভাংচি দিয়ে তাকে শাসন করে। পড়া-শোনা তো করছেই না এমনকি খেলাধূলায় পর্যন্ত মন নেই। বন্ধুরা খেলার মাঠে নিয়ে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করলে চিল্লা-চিল্লি ও গাল-মন্দ করে তাদের ভীষণ অপমান করছে। মাঝে স্কুলে গিয়েও সহপাঠীদের সাথে খারাপ আচরণ করেছে। শেষে মাস্টারের কাছে পিটুনি খেয়ে এখন স্কুলে যাওয়াই বন্ধ করে দিয়েছে। বুঝিয়ে-শুনিয়ে কোনো ভাবেই তাকে আর স্কুলে পাঠানো যাচ্ছে না। এর মধ্যে আরও একটা ব্যাপার রয়েছে। ইমাম সাহেবকে অত্যন্ত গোপনে সেটা জানানো হয়েছে। যাতে উপস্থিত অন্যান্য রোগীরা শুনতে না পায়। ইমাম সাহেবের কানের অতি কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে মজিদের বাবা বলেছেন,

— বদমাশটা একটা মেয়ের সাথে লাভ করেছে।

লাভ করার কথা শুনে ইমাম সাহেব স্বাভাবিকভাবে বলে উঠলেন,

— বাহ! বাহ! ভালোই তো।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে মজিদের বাবা বলেন,

— ভাল?

ইমাম সাহেব আবারো আগের মতোই সহজভাবে বলেন,

— আরে ভাই লাভই তো করেছে লোকসান তো আর করেনি।

মজিদের বাবা ঠোট বাঁকিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন,

— তা পটাতে পারলে না হয় লাভই হতো কিন্তু মেয়েটা বেঁকে বসেছে। শিক্ষকদের বলে পিটুনি খাইয়েছে। স্কুলে যাওয়ার মুখই আর নেই ওর। লাভের বদলে এখন তাই লোকসানই হয়ে গেছে।

ঘটনা শুনে ইমাম সাহেবের চোখ দুটো চকচক করে ওঠে। প্রেমের কেসে হাদীয়া বেশি পাওয়া যায়। এক তাবীজে তিন থেকে পাঁচ হাজার পর্যন্ত কামাই করা যায়। ঐ মেয়েটাকে পটানোর জন্য মজিদের বাবাকে একটা তাবীজ নিতে রাজি করাতে পারলেই হাজার তিনেক টাকা তার পকেটে চলে আসবে ভেবেই ভিতরে ভিতরে তিনি এখন রোমাঞ্চ অনুভব করছেন। তিনি নিজেই তাই এখন মজিদের বাবাকে পটানোর চেষ্টা করেন। মুখটা যতটা সম্ভব গম্ভীর করে বলেন,

— আরে চিন্তা করবেন না। এমন তদবীর দেবো যে, ঐ মেয়ে বাপ বাপ করতে করতে আপনার বাড়ি এসে হাজির হবে।

কথাটা শুনে মজিদের বাবা যেনো দ্বিধায় পড়ে যান। আমতা আমতা করে বলেন,

— বাপ বাপ করবে কাকে? আমাকে নাকি আমার ছেলেকে?

ইমাম সাহেব নিজেও ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তায় পড়ে যান। তারপর বিষয়টা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলেন,

— বাপ বলবে আপনাকে আর আপনার ছেলেকে বলবে স্বামী। মজিদ, আমার মজিদ- বলতে বলতে ঐ মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে আপনার বাড়ি এসে হাজির হবে।

কথাটা শুনে মজিদের বাবার চোখটা প্রথমে জ্বলজ্বল করে উঠলো। মেয়েটা বড় লোকের মেয়ে। শুধু বড় লোক নয় যাকে বলে কোটিপতি বা কোটি কোটি পতি। এত টাকা তার আছে যে মজিদ আর মজিদের বাবা দুজন মিলেও গুনে শেষ করতে পারবে না। অমন

লোকের মেয়ে যদি মজিদের ভাগ্যে জোটে তবে মজিদ তো বটেই সেই সাথে তার চৌদ্দ গোষ্ঠীর ভাগ্যও ঘুরে যেতে পারে। সারাটা জীবন চাষাবাদ আর রাখালী করে কাটিয়েছেন তিনি। মজিদের কপালেও পৈত্রিক সূত্রে জুটেছে সেই একই কর্ম। এখন মজিদের বিয়েতে বড় একটা দান মারতে পারলেই কেবল তাদের ভাগ্যটা বদলাতে পারে। এমন ভেবে প্রথমে ইমাম সাহেবের প্রস্তাবে কিছুটা আনন্দিত হলেও পরক্ষণেই তার মনে পড়ে যায় মেয়ের বাপ-চাচারা যে কেবল কোটিপতি তাই নয়, ক্ষমতাবানও বটে। মেয়ের বাবা চেয়ারম্যান আর চাচা এম, পি। এমন মেয়েকে তাবীজ করে ঘরে তুলে আনলেও শেষমেষ ঘরে যে আটকে রাখা যাবে না সেটা তার ভাল করেই জানা আছে। তারা যে, দারোগা-পুলিশ আর গোন্ডা-বদমাশ পাঠিয়ে বাপ-বেটাকে ধোলায় দিয়ে মেয়েকে ঠিকই ফিরিয়ে নিয়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ঘর-বাড়ি ভেঙে-চুরে ভিটে ছাড়াও করে দেবে নিশ্চয়। অতএব, তাতেও লাভ না হয়ে লোকসানই হয়ে যাবে।

মজিদের বাবাকে চুপ থাকতে দেখে ইমাম সাহেব আবারো তাকে উৎসাহ দিয়ে বলেন,

— চিন্তার কোন কারণ নেই। এমন তাবীজ দেবো যে, ঐ মেয়ে মজিদ মজিদ করে একেবারে পাগল হয়ে যাবে।

মজিদের বাবা আতংকে শিউরে উঠে বললেন,

— না, না। তার দরকার নেই। এক পাগল নিয়েই বিপদে আছি আবার আরেক জনকে পাগল বানিয়ে বিপদ বাড়াতে চাই নে। এমন লাভের কোনো দরকার নেই আমার।

কথাটা শুনে ইমাম সাহেবের মুখটা হাড়ির কালির মতো কালো হয়ে গেলো। লাভের বদলে তারও আজ লোকসান হয়ে গেলো। বাধ্য হয়ে তাই তিনি সস্তা দরের কিছু ঝাড়ফুঁকই করলেন মজিদকে।

মজিদ তার দিকে এতক্ষণ হা করে চেয়ে ছিলো। ঝাড়ফুঁকটা শেষ হতেই সে বলল,

— হুজুর একটা প্রশ্ন করবো?

প্রশ্নের কথা শুনে ইমাম সাহেবের মুখটা বিষন্ন হয়ে গেলো। আজকালকার পোলাপানগুলো আবার ভীষণ তেঁদড়। এমন সব প্রশ্ন করে যার কোনো আগা মাথা নেই। কণ্ঠের স্বরে ভীষণ বিরক্তি প্রকাশ করে তাই তিনি বলেন,

— কী প্রশ্ন?

কিছুমাত্র বিলম্ব না করে মজিদ বলে,

— জান্নাতে কি প্রেম আছে?

কথা শুনে মজিদের বাবা হেসে ওঠেন। ভূতে ধরার পর থেকে মজিদ যাকে পাচ্ছে তাকে এই একই প্রশ্ন করছে। গাঁও-গ্রামের খুদে মোল্লারা তো বটেই এমনকি আশে-পাশের মসজিদ-মাদ্রাসায় যেসব মুফতী-মুহাদ্দিস আছে আর দূর-দুরান্ত থেকে যেসব বড় বড় বক্তারা মাহফিল করতে এই অঞ্চলে এসেছে তাদের সবাইকে এই একই প্রশ্ন করেছে মজিদ। প্রশ্ন শুনে তো তারা সবাই হা হয়ে গেছে। কি যে উত্তর হবে তা কেউ বলতে পারেনি। দুয়েকজন উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করলে মজিদ আবার এমন সব পাল্টা প্রশ্ন করেছে যে, প্রশ্ন শুনে তাদের জ্ঞানের ভাড় পূরা শূন্য হয়ে গিয়েছে। তাতে অবশ্য মজিদের বাবা খুশিই হয়েছেন। বড় লোকের মেয়েটার সাথে লাভ করে লোকসান আর যাই হোক বাঘা বাঘা সব আলেম-ওলামাদের টাইট করার মতো একটা প্রশ্ন যে তার ছেলের মাথায় এসেছে তাতেই তার রাখাল জীবন সার্থক হয়েছে। সেই একই প্রশ্ন ইমাম সাহেবকে এখন করা হচ্ছে দেখে মজিদের বাবা ভেতরে ভেতরে দারুণ রোমাঞ্চ অনুভব করেন। তিনি বেশ বুঝতে পারছেন বেচারা ইমাম সাহেব এবার ভাল মতোই টাইট হয়ে যাবে।

আসলে প্রথম দর্শনেই লাবনীকে অসম্ভব ভাল লেগে যায় মজিদের। সেদিন থেকেই তার মনে হতে থাকে তাকে ছাড়া তার জীবন বৃথা। এতটা আকর্ষণের কারণ অবশ্য স্পষ্ট নয়। পরীর মত সুন্দর চেহারা আর ব্লেডের মতো তীক্ষ্ণ মেধাই যদি এই আকর্ষণের প্রধান কারণ হতো তবে ক্লাসের আর দশটা মেয়ের মধ্যে লাবনীর জোড়া আর দুয়েকটা খুঁজে পাওয়া যেতো নিশ্চয়। সুন্দরী আর মেধাবী ছাত্রীর অভাব ছিলো না মজিদের ক্লাসে। তাদের মধ্যে অনেকেই এক রকম যেচেই ভাব জমাতে আসতো মজিদের সাথে। যারা ভাব জমাতে আসতো তাদের সবাই যে তার সাথে প্রেম করতে চাইতো তা নিশ্চয় নয় কিন্তু সবার সাথে ভাব জমাতে শুরু করলে কারো না কারো সাথে সম্পর্কটা যে প্রেম পর্যন্ত গড়াতো সে নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু লাবণীর সাথে দেখা হওয়ার আগ পর্যন্ত কোনো মেয়েকেই পাত্তা দেয়নি মজিদ। প্রেম-প্রীতির বন্ধনেও আবদ্ধ হয়নি কখনও। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে গুটিয়ে রেখেছিলো এতদিন। এর কারণ কিন্তু এই নয় যে, প্রেম

সম্পর্কে আদৌ তার মধ্যে কোনো আগ্রহ বা আকর্ষণ ছিলো না। বরং এর কারণ আসলে সম্পূর্ণ উল্টো। প্রেম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান আর তীব্র আকর্ষণই এই নিষ্ক্রিয়তার প্রধান কারণ। আসলে প্রেমের ব্যাপারে মজিদের আগ্রহ অনেক ছোট থেকেই। যখন তার বয়স দশ/বারো বছর তখন থেকেই সে প্রচুর রুপকথার গল্প পড়তো। তার বেশিরভাগই ছিলো প্রেমের গল্প। রাখালের সাথে রাজকুমারীর প্রেম, কাঠুরিয়ার সাথে জলপরীর প্রেম, পরীর দেশের রাণীর সাথে পথ ভোলা এক যুবকের প্রেম ইত্যাদি কত যে প্রেমের কাহিণী সে পড়েছে তার কোনো গণতি নেই। পাড়া সম্পর্কে দাদী বা নানী হয় এমন সব বৃদ্ধা মহিলারাও তাকে শোনাতো নানা রকম প্রেম-প্রীতির গল্প। তাদের গল্পগুলো হতো আরো বেশি খোলামেলা। বইয়ের লেখার মতো শালীন ভাষার কথা বলতেন না তারা। সম্পর্কে দাদী বা নানী হওয়ার কারণে ভদ্রতার কোনো বালাই না রেখেই তারা মজিদকে শোনাতেন প্রেমের গভীর থেকে গভীরতর সব রহস্যের খোলামেলা বর্ণনা। সেসব শুনে লোম খাড়া হয়ে যেতো মজিদের। গল্প হয়তো তার সাথে আরো অনেক কিশোরই শুনতো কিন্তু তার মতো করে কেউ ওগুলোর মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতো কিনা সেটা মজিদ জানে না। পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে উঠানে বিছানা পেতে চলতো গল্প শোনার আসর। বানু দাদী গল্প বলতে শুরু করলে শেষ না করে কখনও থামতেন না। গল্প শুনতে শুনতে সবাই ঘুমিয়ে পড়তো শুধু মজিদ ছাড়া। দুটি চোখে পূর্ণিমা চাঁদের দিকে অপলকে চেয়ে থেকে মায়াবী জোস্নায় স্নান করতে করতেই সে শুনতো পরমা সুন্দরী সব কিশোরী আর মায়াবীনী তরুণীদের ছলে বলে কৌশলে প্রেমের ফাঁদে ফেলার আকর্ষণীয় সব কাহিনী। কাহিনীর মধ্যেই মজিদ যেনো নিজেকে হারিয়ে ফেলতো। তার মনে হতো সে নিজেই কাহিনীর নায়ক। সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে সে-ই যেনো রাক্ষস রাজ্য হতে অপহৃত রাজকন্যাকে উদ্ধার করলো, আর খুশি হয়ে রাজকন্যা তাকেই যেনো আলিঙ্গন করে কপালে চুমু দিলো। কাহিনীর শেষে তারই সাথে যেনো বিয়ে হলো তার। এভাবে চিন্তা করার কারণে কাহিনীর ছত্রে ছত্রে দেহ-মন তার রোমাঞ্চিত হতো। বানু দাদী একটু থামলেই সে বলে উঠতো,

— তারপর, তারপর।

মনে হতো যেনো, তার তর সইছে না। বানু দাদী হেসে বলতেন,

— তুই কি শেষে মজনু হবি নাকি রে?

মজনুর মতো ব্যর্থ প্রেমিক হতে চায়নি মজিদ। কিন্তু শেষে তাই হয়ে গেলো। গল্প শুনতে শুনতে তার আশার পাহাড় হয়ে গিয়েছিলো অনেক বড়। তাকে সব চেয়ে বেশি আকর্ষণ করতো অসম প্রেমের কাহিনী। যেখানে ছেলেটা হবে রাখাল বা কাঠুরিয়া আর বিপরীতে নায়িকা হবে কখনও বা রাজকুমারী আবার কখনও ধনীর দুলালী। রুপ হবে তার জোস্নার মতোই অপরুপ আর কণ্ঠের স্বর হবে সানাইয়ের সুরের চেয়েও সুমধুর। মনটা হবে অহংকারী, মেজাজ হবে ভীষণ তেজী। প্রথম দর্শনে মনে হবে তার ধারে কাছে ঘেঁষাও দায়। প্রেমের ফাঁদে ফেলে তাকে উপভোগ করার চিন্তা তো সুদূর পরাহত। চাঁদকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসার মতোই অসাধ্য। কিন্তু ছলে বলে কৌশলে এই অসাধ্যকেই সে সাধন করবে। দিগ্বিজয়ী বীরের মতোই গর্ব-অহংকারের কঠিন প্রাচীর ভেঙে জয় করবে প্রেমিকার মনটি। এই রাজকুমারীই শেষে তার মতো রাখালকে জড়িয়ে ধরে তার কপালে চুম্বন করবে। নিজের দেহ মনকে সে তার হাতে সপে দেবে যা খুশি করার জন্য। ঠিক যেনো রুপকথার কাহিনীর মতো। একেই বলে সত্যিকার প্রেম। এ নিয়ে যতবার ভাবে মজিদের মনটা ভীষণ তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। যে মুহুর্তে রাজকুমারী নিজেকে তার হাতে তুলে দেবে সেই মুহুর্তটিকে তার নিকট হাজারটা বাসর রাত অপেক্ষা বেশি উপভোগ্য মনে হয়। এমন একটা প্রেমের জন্য তাই তার মনটা সদা ব্যাকুল হয়ে থাকে। এর বাইরে নারী-পুরুষে আর যত সম্পর্ক আছে তা তার নিকট পুতুল খেলা বলেই মনে হয়। তাকে প্রেম বলতে সে নারাজ।

— প্রেমের পরম তৃপ্তিই যার মধ্য নেই তাকে প্রেম কিভাবে বলা যায়!

একারণেই এতদিন অন্য কোনো মেয়ের দিকে তার মন ঝোঁকেনি। এই অলীক স্বপ্নই আজ তাকে পাগল বানিয়ে দিয়েছে। বানু দাদীর কথামতো আজ সে মজনুই হয়ে গেছে। লাবনীকে প্রথম দেখেই সে বুঝেছিলো এমন একটা মেয়েকেই সে খুঁজছে নিজের প্রেম কাহিণীর নায়িকা হিসেবে। সুন্দরী আর ধনীর দুলালী হওয়ার পাশাপাশি অহংকার, তেজ ইত্যাদি যত রকম গুণাবলী মজিদ তার প্রেমিকার মধ্যে দেখতে চেয়েছিলো লাবণীর মধ্যে তার সবই বিদ্যমান ছিলো পূর্ণ মাত্রায়। প্রথম দিন থেকেই তাই মনে মনে তাকেই নিজের রাজ্যের রাজকুমারী বানিয়ে ফেলেছিলো মজিদ। ভেবেছিলো রুপকথার কাহিনীর মতোই একদিন তাকে জয় করতে পারবে। আজ যে মেয়েটি রয়েছে তার হাতের নাগালের বাইরে সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দিয়ে তাকেই একদিন হাতের মুঠোতে

বন্দি করবে সে। রচনা করবে নতুন এক প্রেম কাহিনী যা রুপকথার কাহিনীকেও হার মানাবে।

কিন্তু জীবন রুপকথার কাহিনী নয়। লাবণীকে কোনো রাক্ষস বন্দী করেনি। আর জীবন যুদ্ধে সে কোনো সমস্যায় পড়লেও তাতে মজিদের সহযোগিতার কোনো প্রয়োজন হয়নি তার। কৃতজ্ঞতায় মজিদের সামনে নত হওয়ার মতো পরিবেশও তাই ঘটেনি। কৌশলে তার মনকে দখল করে নেওয়ার মতো কোনো কার্যকরী প্লান-প্রোগ্রামও মজিদ করে উঠতে পারেনি। লাবনীর সাথে তার প্রেম তাই প্রথম ধাক্কাতেই ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। তার পক্ষ থেকে হঠাৎ দেওয়া প্রেমের প্রস্তাবকে লাবণী লাঞ্চনা আর অপমান হিসেবেই গণ্য করেছে। আর তাই সরাসরি নালিশ দিয়েছে শিক্ষকদের নিকট। তার বাবার কানেও তুলতে চেয়েছিলো। শিক্ষকরাই তাকে নিরস্ত করেছে বুঝিয়ে-শুনিয়ে। তারপর তার মন রক্ষা করার জন্য মজিদকে বেধড়ক পিটিয়ে আর অপমান করে স্কুলে যাওয়ার রাস্তা এক রকম বন্ধই করে দিয়েছে তারা। অন্তরে তাই মজিদের এখন ভীষণ ক্ষোভ। লাবণীর প্রতি। লাবণীর মতো তার পছন্দের গুণাবলী যেসব মেয়েদের আছে তাদের সবার প্রতি। দমে যাওয়ার পাত্র মজিদ নয়। মজনুর মতো ব্যার্থ প্রেমিক হওয়ার ইচ্ছা একদম নেই তার। এখনও সে নিজেকে রুপকথার নায়কই ভাবে আর লাবণীর মতো মেয়েদের কঠিন হৃদয়কে জয় করে তার হাতের খেলনাতে পরিণত করার স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখে, প্রেমের পরম তৃপ্তিকে বাস্তবে উপলব্ধি করার। এই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার জন্যই সে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে। খেলা-ধূলা, পড়াশুনা ইত্যাদি দুনিয়াবী কোনো কাজে তাই তার মন নেই। এটাকেই মানুষ পাগলামি মনে করে। সবাই তাই এখন তাকে পাগল বলে। কেউ আবার একটু রস সংযোজন করে তাকে মজনু বলে ডাকে। যে যা-ই বলুক মজিদ তাতে ক্ষান্ত হবে না। নিজের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করে তবেই সে শুনবে। কিন্তু দুনিয়ার জীবনে এটা যে সম্ভব নয় সেটা সে বুঝে গিয়েছে। এখন তাই সে ভিন্ন রাস্তা ধরেছে। মুসলমানের ছেলে হিসেবে সে আখিরাতের জীবনে বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করে জান্নাত আর জাহান্নামে। সে জানে সব আশা বাস্তবায়ন করা আর সব স্বপ্নকে পুরণ করার একমাত্র জগৎ জান্নাত। জান্নাত মানেই ভোগ-বিলাশ আর হুরদের সাথে প্রেম-প্রীতি। সেই জগতে নিশ্চয় যখন খুশি অসম প্রেমের এই পরম তৃপ্তি উপভোগ করার সুযোগ থাকবে। সে ভাবে,

— ভাল আমল করে জান্নাতে যেতে পারলেই তো তার স্বপ্ন পুরণ হবে।

একারণে বেশ কিছুদিন হলো, সে নামাজ-কালাম শুরু করেছে। কুরআন-হাদীসও এখন সে নিয়মিত পড়ে। বিশেষ করে জান্নাত সম্পর্কে সে তো রীতিমত গবেষণা করে। জান্নাতের খাদ্য-পানীয়, বড় বড় অট্টালিকা, পাখা মেলে উড়ে যাওয়া ঘোড়া ইত্যাদি সকল কিছুই তার ভাল লাগে। তবে কি যেনো শূন্যতা তার মনজগতকে ছেয়ে থাকে। একটি প্রশ্ন বারংবার মনে জাগে।

— জান্নাতে কি প্রেম করার সুযোগ থাকবে? রুপকথার মতোই অসম প্রেম?

তার মনে এই প্রশ্ন সৃষ্টি হওয়ার যথেষ্ট কারণও আছে। জান্নাতের বর্ণনায় পরমা সুন্দরী হুরদের কথা বলা হয়েছে বারংবার। কিন্তু তাদের বৈশিষ্ট সম্পর্কে বলা হয়েছে তারা হবে বিনয়ী, অনুগত, লজ্জাবনত ইত্যাদি। বিপরীতে হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছে জান্নাতী ব্যক্তি সেখানে রাজার ভূমিকায় থাকবে। তার বাসস্থান হবে বড় বড় সব রাজ-প্রাসাদ, বসবার স্থান হবে রাজ সিংহাসন আর মাথায় থাকবে রাজ মুকুট। খানা-পিনা ও ফল-ফলাদির পাশাপাশি পরমা সুন্দরী সব হুরেরা থাকবে তার হাতের মুঠোয়। যখন যাকে খুশি উপভোগ করবে সে। এসব ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে চমৎকার। সকল মানুষই পছন্দ করে সবকিছু এভাবেই তার হাতের নাগালে থাক। চাহিদার সব জিনিস এমনই সহজলভ্য হোক। সাধারনভাবে মজিদও তা পছন্দ করে। হাজার হাজার অনুগত হুর তার অধিকারে থাকলে সেটা যে উপভোগের চুড়ান্ত ব্যবস্থা তাতে কে সন্দেহ করতে পারে! কিন্তু কেনো জানি মজিদের মনে হয় তার চেয়ে অনেক বেশি উপভোগ্য বিষয় হলো, কোনো একজন স্বাধীনচেতা, অহংকারী আর তেজী স্বভাবের হুরকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে বশে এনে উপভোগ করা। যে কেউ হয়তো বলবে এটা পাগলামি। খাঁচায় বন্দি পাখি ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলে গিয়ে তাড়িয়ে পাখি শিকারের চেষ্টা করার মতো। কিন্তু মানুষের মন আসলেই খুব বৈচিত্রময়। তাই তো তাড়িয়ে শিকার ধরার মধ্যেই অনেকে অধিক মজা পায়। পূর্ব যুগের রাজা বাদশারাও একারণে শিকারে বের হতেন মাঝে মাঝেই। যদিও খাদ্য সামগ্রীর কোনো অভাব তাদের ছিলো না। মনের সৃষ্টিকর্তা এটা জানেন। তাইতো তিনি এমন উদ্ভট মানসিকতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। একটি হাদীসে এসেছে, একজন ব্যক্তি বলবে, হে আল্লাহ আমি চাষ করতে চাই। মহান আল্লাহ বলবেন,

— তোমার খাদ্য খাবার যা কিছু প্রয়োজন তা তো আমি তোমাকে দান করেছি।

অর্থাৎ চাষ করার কি দরকার? তবু সেই ব্যক্তি জিদ ধরবে। তখন মহান আল্লাহ তাকে চাষ করার জন্য বীজ প্রদান করবেন। আর বলবেন,

— নাও হে আদম সন্তান। তোমার তো কিছুতেই পেট ভরে না।

এই হাদীস পাঠ করে মজিদ ভাবে যদি আল্লাহ আমাকে জান্নাতী করেন আর তার নিকট আমি দাবী করে বলি,

— আমি প্রেম করতে চাই। রুপকথার মতো অসম প্রেম। রাখালের বেশে অহংকারী কোনো রাজকুমারীর মনকে আমি ছলে বলে কৌশলে জয় করতে চাই। তারপর প্রথম যেদিন সে আমার হাতে নিজেকে সঁপে দেবে সেদিনের আনন্দকে উপভোগ করতে চাই।

তবে কি তিনি সে ব্যবস্থা করে দেবেন না? হাতের নাগালে হাজার হাজার হুর-পরী আছে তা থাক। সময়মতো তাদের সাথেও আমোদ-প্রমোদ করা যাবে। কিন্তু মাঝে মাঝে যখন ব্যতিক্রম কিছু পেতে ইচ্ছা হবে তখনও কি এমন একটা প্রেমের সুযোগ জান্নাতে থাকতে পারে না?

সন্দিহানভাবে মজিদ নিজেই নিজেকে এই প্রশ্ন করে। হাদীস কুরআন ঘেটে সে নিজেও এর উত্তর বের করার চেষ্টা করে। আর আলেম-ওলামা, মুফতি মুহাদ্দিস যাকে সামনে পায় তাকেও করে এই প্রশ্ন। এ প্রশ্নের একটা সদুত্তোর না পাওয়া পর্যন্ত সে যেনো শান্তি পায় না। এই নেয়ামতটি ছাড়া জান্নাতের সকল নেয়ামতই যেনো তার নিকট অসম্পূর্ণ মনে হয়। আজ ঝাড়ফুঁকের ফাঁকে সুযোগ পেয়ে তাই সে ইমাম সাহেবকেও প্রশ্নটি করে।

প্রশ্ন শুনে ইমাম সাহেব তো হতবাক। বাপের জন্মে তিনি এমন প্রশ্ন শোনেননি। উত্তর শোনার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কয়েক বছর মাদ্রাসায় কুরবানীর চামড়া তুলে তুলে যতটুকু বিদ্যা হাসিল করেছেন তাতে কোনো রকমে ঝাড়ফুঁক আর তাবীজ-তুমারটা করতে পারেন। এর বাইরে কোনো প্রশ্ন শুনলে তাই তিনি প্রসন্ন হতে পারেন না। তবে এই প্রশ্নের উত্তরটা তার কাছে সহজই মনে হয়। তাড়াহুড়া করে তিনি বলে ওঠেন,

— জান্নাতে প্রেম! নাউযু বিল্লাহ!, আস্তাগফিরুল্লাহ্! দুনিয়াতেই যে জিনিস হারাম জান্নাতে সেটা কি করে থাকবে?

এই প্রশ্নের এমন উত্তর মজিদ এর আগেও শুনেছে। জবাবও তার আগে থেকেই তৈরী আছে। সে ইমাম সাহেবকে বুঝিয়ে বলে,

— দেখুন দুনিয়াতে মদ পান করা হারাম, গান-বাজনা শোনা হারাম, রেশমী কাপড় পরিধান করা হারাম, সোনা-রোপার পাত্র ব্যবহার করা হারাম কিন্তু এসবই তো জান্নাতে বৈধ হবে। তাহলে প্রেম দুনিয়াতে হারাম হলেও জান্নাতে বৈধ হতে অসুবিধা কোথায়?

মজিদের মুখে এসব কথা শুনে ইমাম সাহেব একটু ভড়কে গেলেন। ছেলেটা পাগল হলেও তার কথায় যুক্তি আছে। তবে তিনিও সহজে হার মানার পাত্র নন। তিনি হলেন, যাকে বলে, পাশ করা মওলানা। অতএব, অত সহজে কেউ তাকে বিতর্কে হারাতে পারবে না। সে লাইলীই হোক আর মজনুই হোক। সাথে সাথে তিনি আলোচনার মোড় পরিবর্তন করেন। দরাজ কণ্ঠে বলেন,

— না, সে তো বটেই। প্রেম ছাড়া কি আর জীবন চলে। অতগুলো হুর-পরী থাকবে তাদের সাথে প্রেম-প্রীতি হবে আরো কতকিছু হবে ......

মজিদ তাকে থামিয়ে বলে,

— কিন্তু হুর-পরীরা থাকবে আপনার হাতের মুঠোয়। তারা হবে আপনার হুকুমের গোলাম। যখন খুশি ডাকবেন যা খুশি করবেন কোনো বাধা নেই। আর প্রেম মানে হলো, কোনো মেয়েকে ছলে বলে কৌশলে বাগে আনা বা ফাঁদে ফেলা। হাতের মুঠোয় থাকা অনুগত হুর-পরীদের সাথে তো আর সেটা চলতে পারে না।

ইমাম সাহেব বুঝলেন মজিদের এ কথায়ও যুক্তি আছে। যুক্তি-তর্কে আবারো ধরাশায়ী হয়ে মুখটা ফেঁকাসে হয়ে গেলো তার। প্রেম করে একবার ছেকা খেয়ে প্রেম বিষয়ে যে মজিদের পি.এইচ.ডি সমমানের অভিজ্ঞতা হাসিল হয়ে গেছে এতক্ষণে তিনি তা হাড়ে হাড়ে টের পেলেন। ভাবলেন, তিনিও যদি প্রেম করে একবার ছেকা খেতেন তবে কতই না ভালো হতো! প্রেম বিষয়ে তারও অনেক অভিজ্ঞতা হয়ে যেতো। তবে একটা বিষয় তিনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলেন না। একই সাথে বিরক্তি আর বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন,

— কিন্তু হাতের মুঠোয় যখন পেয়েই যাচ্ছি তখন অত ছলা-কলার দরকারটা কি?

এই প্রশ্নটির জন্যও মজিদ তৈরী ছিলো। এতদিনে সে নামধারী সব আলেম-ওলামাদের জ্ঞানের দৌঁড় সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। তাদের জ্ঞান প্রথম শ্রেণীর সিঁড়িটাই পার হতে পারেনি এখনও পর্যন্ত। আর দশটা স্বাভাবিক মানুষ যেভাবে চিন্তা করে তারাও সকল বিষয়ে সেভাবেই চিন্তা করে। কোনো ব্যাপারে জ্ঞানী লোকের মতো করে ভাবে না। আপেল পড়া দেখে উপরে না গিয়ে নিচে কেনো পড়লো এমন প্রশ্নও তারা করে না। ফলে তার উত্তরে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও আর তাদের আবিষ্কার করা হয়ে ওঠে না। কাউকে হাতের মুঠোয় পেয়ে যাওয়া আর ছলে বলে কৌশলে তার মনটা অধিকার করার মাঝে যে আকাশ পাতাল ব্যবধান সেটাই যে ধরতে পারে না তার সাথে প্রেম নিয়ে কথা বলাই অকারণ এবং অনুচিৎ। তবু মজিদ সহজ একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে।

— মনে করুন। জান্নাতের মধ্যে খাদ্য-পানীয় সরাসরি আপনার পেটে চলে গেলো। মুখে তোলো রে, দাঁতে পেষো রে, জিভে চাটো রে, গলা দিয়ে গেলো রে ইত্যাদি কোনো হাঙ্গামা করতে হলো না আবার পেটও ভরলো। তবে বিষয়টা কেমন হবে?

ইমাম সাহেব এই যুক্তিটিও বুঝতে পারেন। খাদ্য-খাবারের ব্যাপারে অপরিসীম অভিজ্ঞতা আছে তার। ইমাম সাহেব হিসেবে এলাকার বাড়ি বাড়ি তার প্রতিদিনই খাওয়া পড়ে। সেই সাথে আসে বিয়ে বাড়ির দা'ওয়াত। সাত বাড়ি খেয়ে খেয়ে তার জিভ হয়ে গেছে বারো হাত। মাছ-মাংস, পোলাও-কোর্মা, কোপ্তা-কাবাব ইত্যাদি কত রকমের খাবারে যে কত রকমের স্বাদ! আহা! মনে পড়লেই তার জিভে জল চলে আসে। কিন্তু এতসব স্বাদ তো জিভের কারণেই পাওয়া যায়। এসব খাবার যদি মুখ দিয়েই না ঢোকে আর জিভেই না ঠেকে বরং অন্য কোনোভাবে সরাসরি পেটে চালান হয়ে যায় তবে তো তার কোনো স্বাদই পাওয়া যাবে না। এতে তো চরম ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যাবে। বাইশ বছর ধরে ইমামতি করে এতটুকু অভিজ্ঞতা তার হয়েছে। জোরে জোরে মাথা নেড়ে তাই তিনি বলেন,

— না, না বাবা। এতে পেট ভরলেও খাবারের তো কোনো স্বাদ পাওয়া যাবে না। না, না। এটা কোনো ভাল ব্যাপার না। খাবারের স্বাদটা পেতেই হবে তাতে চিবানো, মাখানোর যত হাঙ্গামা আছে তাও করতে হবে।

মজিদের কাছে মনে হয়, প্রেমের ছলা-কলা ছাড়াই সরাসরি কোনো মেয়েকে উপভোগ করাটা সরাসরি পেটে খাবার-পানি চালান হয়ে যাওয়ার উদাহরণের সাথে হুবহু না

হলেও মোটামুটি মেলে। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই পেটুক শ্রেণীর। তাই খাবারের ক্ষেত্রে পার্থক্যটা ধরতে পারে কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে তা ধরতে পারে না। ইমাম সাহেবকে বিষয়টা বুঝিয়ে বললে তিনি কিছুক্ষণ নাহু নাহু করে শেষে বিষযটা একরকম স্বীকার করে নিয়ে বলেন,

— বুঝলাম, প্রেমের একটা আলাদা স্বাদ আছে এবং সেটা পাওয়াও জরুরী কিন্তু জান্নাতে সেটা হবে কিভাবে?

মজিদের মনেও সেই একই প্রশ্ন।

— যে জগতে সে রাজা আর হুর-পরী বা অন্য সকল নারী তার অধীনস্ত ও অনুগত সেখানে রুপকথার ঐ সব অসম প্রেমের সুযোগ কিভাবে ঘটতে পারে!

এটাই হলো তার গবেষণার বিষয়। এই গবেষণায় যদি সে সফল হতে পারে তবে প্রেমে ছেকা খাওয়াটা তার সার্থক হবে। সেটা হবে তার জন্য নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তখন সে দুনিয়াতে আবার শান্ত ও ধীর-স্থিরভাবে সময় কাটাবে। তার সকল স্বপ্ন জান্নাতে বাস্তবায়িত হবে এই আশায়।

দুই.

বেশ কিছুক্ষণ আগেই অন্ধকার নেমেছে। সাথে সাথেই গগনে উদিত হয়েছে গনগনে পূর্ণিমার চাঁদ। গরমে ঘরের ভিতরে থাকার কোনো উপাই নেই। রাতের খাবারটা সেরেই আশে-পাশের দু'চার ঘরের ছেলে-মেয়েরা সবাই এসে ভিড় করেছে মজিদদের বাড়ি। মজিদের মা উঠানে খোলা আকাশের নিচে একটা বিছানা পেতে দিয়েছেন। বানু দাদীকে ঘিরে যে যার মতো স্থান দখল করে বসেছে কয়েকজন নয়/দশ বছরের বালক-বালিকা। বানু দাদী তাদের গল্প শোনাচ্ছেন। একটা জাদুকরী শয়তান বুড়ির গল্প। মজিদ ঘর থেকে লক্ষ্য করে, কথা বলার সময় বানু দাদী হাত নাড়িয়ে এমনভাবে কথা বলছেন যে, মনে হচ্ছে স্বয়ং তিনিই সেই শয়তান বুড়ি। কথাও বলার চেষ্টা করছেন দুষ্টু বুড়ির মতো করে। তার গল্প বলার এটাই হলো নিয়ম। যাতে শ্রোতাকে যথাসম্ভব গল্পের মধ্যে ধরে রাখা যায়। মজিদ শুনলো, বানু দাদী ভয়ংকরভাবে ফোঁস ফোঁস করে বলছেন,

এক ছিলো জাদুকরী বুড়ি। সে ছিলো ভীষণ শয়তান। তার এক ছেলে ছিলো কাঠুরে।

কাঠুরে ছিলো ভাল মানুষ। সারাদিন জঙ্গলে কাঠ কুড়িয়ে বাজারে বেঁচে সে সংসার চালাতো। তার মা যেসব শয়তানী কাজ-কর্ম করে বেড়াতো সেগুলো সে পছন্দ করতো না। ঐ কাঠুরের একটা ছেলে ছিলো। সেও ছিলো তার দাদীর মতোই শয়তান। রাস্তার পাশে এক ভাঙা কুড়ে ঘরে তারা সবাই বসবাস করতো। একদিন ঐ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো এক সুন্দরী রাজকুমারী। তাকে দেখে বুড়ির শয়তান নাতিটা বলল,

— আমি ঐ রাজকুমারীকে বিয়ে করবো।

কথা শুনে বুড়ি ধমক দিয়ে বলল,

— আরে দূর বোকা। রাজকুমারী কি কাঠুরের ছেলেকে কখনও বিয়ে করে!

নাতিটা তবু নাছোড়বান্দা। বুড়িকে বলল,

— তুমি তো জাদু-টোনা জানো। জাদুর মাধ্যমে একটা ব্যবস্থা করে দাও।

শেষে বুড়ি বলল,

— জাদু-টোনা করে স্থায়ীভাবে বিয়ে তো হবে না তবে বাসর রাতে তাকে একটিবার উপভোগ করার সুযোগ আমি করে দিতে পারি।

শয়তান নাতিটা এতেই খুশি হলো। আসলে তার লোভও ছিলো কেবল রাজকন্যার সুন্দর দেহটার উপর। তার মনটাকে অধিকার করার মতো উঁচু মানসিকতা ছিলো না তার। পরে একদিন বুড়ি শুনতে পেলো আগামী মাসের প্রথম সোমবারে রাজকন্যার সাথে পাশের রাজ্যের রাজপুত্রের বিয়ে হবে। বুড়ি তার নাতিকে নিয়ে পাশের রাজ্যে গিয়ে হাজির হলো। তারপর সেই রাজপুত্র শিকারে বের হলে জঙ্গলের মধ্যে তাকে একা পেয়ে বুড়ি জাদু করে রাজপুত্রের রুপটা করে দিলো তার নাতির মতো আর তার নাতির রুপটা করে দিলো রাজপুত্রের মতো। সেই সাথে রাজপুত্রের স্মরণ শক্তিও দিলো পাল্টে কিন্তু তার নাতির স্মরণশক্তি টিকে থাকলো। পরে সে নাতিকে বলল,

— যতদিন রাজকুমারীর কুমারিত্ব থাকবে ততদিন এই জাদু টিকে থাকবে। যে রাতে তার কুমারিত্ব নষ্ট হবে সেই রাতের সুবহে সাদিকের সাথে সাথেই এই জাদু শেষ হয়ে যাবে। বাসর রাতে কুমারীর সাথে মিলন করে সুবহে সাদিকের আগেই তাকে তাই পালিয়ে আসতে হবে।

বুড়ির নাতি তার কথায় সম্মত হয়ে চলে গেলো রাজবাড়ি। আর রাজপুত্রকে সাথে নিয়ে বুড়ি চলল তার নিজের বাড়ি। যথা সময়ে রাজকন্যার বিয়ের আয়োজন করা হলো। পাশের রাজ্যের রাজপুত্র অনেক সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এসে বিয়ে করে তাকে নিয়ে চলল নিজের রাজ্যে।

আসল রাজপুত্র সেদিন কাঠুরের সাথে জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়েছিলো। নিজেকে এখন সে কাঠুরের ছেলে বলেই মনে করে। আগের কোনো স্মৃতি তার স্মরণে ছিলো না। আর কাঠুরেও জানতো এটাই তার ছেলে। বুড়ি যে কি করেছে তার কোনো খোঁজ খবরই সে রাখতো না। সেদিন কাঠ কাটতে কাটতে তাদের অনেক রাত হয়ে গেলো। তারা ফল-মূল খেয়ে জঙ্গলেই ঘুমিয়ে পড়লো।

ওদিকে রাজকন্যাকে বিয়ে করে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় ডাকাত পড়লে নকল রাজপুত্র ভয়ে পালিয়ে গেলো। রাজপুত্রকে পালাতে দেখে সাথে থাকা সৈন্যরাও পালিয়ে গেলো। ডাকাতরা রাজকন্যাকে একা পেয়ে বন্দি করে জঙ্গলে নিয়ে আসলো। জঙ্গলে এক স্থানে একটা কুড়ে ঘরে তাকে আটকে রেখে তারা মদ-তাড়ি খেতে লাগলো।

বন্দি রাজকন্যা জোরে জোরে চিৎকার করছিলো। তার চিৎকার শুনে কাঠুরে আর তার ছেলের ঘুম ভেঙে গেলো। কেউ বিপদে পড়েছে বুঝতে পেরে তারা দুজন দুটি কুঠার হাতে সাহায্যের জন্য এগিয়ে গেলো। তখনও তারা জানতো না যে মেয়েটি রাজকন্যা। তারা দেখলো দুজন ডাকাত মেয়েটার কাছে পাহারায় আছে আর বাকীরা একটু দূরে আড্ডা দিচ্ছে। রাজপুত্র কাঠুরেকে বলল,

— বাবা আমাদের হাতে দুটি কুঠার আছে। আমরা এক সাথে গিয়ে দুজন ডাকাতকে একবারে শেষ করে দেবো। তারপর মেয়েটাকে নিয়ে পালিয়ে যাবো।

তারা তাই করলো। তারপর মেয়েটাকে নিয়ে তারা পালিয়ে গেলো। জঙ্গলে কাঠুরে অনেক গোপন জায়গা চিনতো। মেয়েটাকে এমনই একটা জায়গায় লুকিয়ে রেখে তারা দুজনে পালাক্রমে পাহারা দিতে লাগলো। প্রথম রাতে কাঠুরে পাহারা দিলো আর তার ছেলে ঘুমিয়ে ছিলো। শেষ রাতে কাঠুরে ঘুমাতে গেলো আর তার ছেলে পাহারা দিতে লাগলো। রাজকন্যাও এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলো। হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেলো। তার চোখ পড়লো কাঠুরের ছেলের দিকে। সে-ই যে তাকে উদ্ধার করেছে আর এতটা কষ্ট করে

না ঘুমিয়ে এতক্ষণ পাহারা দিচ্ছে তাই ভেবে তার মনটা মমতায় গলে গেলো। কিসের একটা টানে গোপন জায়গাটা থেকে উঠে এসে সে বসলো কাঠুরের ছেলের পাশে। একেবারে তার কোল ঘেঁষে। দুজন তারা অনেক গল্প করতে লাগলো। গল্প করতে করতেই রাজকন্যা নিজের পরিচয় দিলো। আর সব ঘটনা বলল। ছেলেটি সব শুনে বলল,

— চিন্তা নেই। সকাল হলেই আমি তোমাকে ঐ রাজপুত্রের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসবো।

প্রথমবারেই ছেলেটা তাকে তুমি করে বলছে শুনে রাজকন্যার মনটা ভীষণ রোমাঞ্চিত হলো। সে বুঝতে পারলো কাঠুরের ছেলেটা ভীষণ সহজ-সরল আর সাদা-মাটা। আবার বীরপুরুষও বটে। মনে মনে তাকে খুব পছন্দ হয়ে গেলো তার। বিপরীতে যে রাজপুত্রের সাথে তার বিয়ে হয়েছিলো তার কথা ভেবে তার মনটা বিষিয়ে উঠলো। সে একটা কাপুরুষ। তা না হলে কি আর নতুন বউকে ফেলে ওভাবে পালিয়ে যায়! মনে মনে রাজকন্যা ভাবে ফুলের মতোই পবিত্র তার এই দেহটাকে উপভোগ করার কোনো অধিকারই নেই ঐ কাপুরুষ রাজপুত্রের। ভীষণ রাগে গজ গজ করতে করতে তাই সে বলে উঠলো,

— নিজের বউকে ফেলে যে পালায় অমন স্বামীর ঘরে আমি যাবো না।

ছেলেটি বলল,

— তাহলে না হয়, তোমার বাপের বাড়িতেই পৌঁছে দেবো।

রাজকন্যা আবারো ঠোট ফুলিয়ে বলল,

— অমন ছেলের সাথে যারা আমাকে বিয়ে দেয় সেখানেও ফিরে যাবো না আমি।

ছেলেটা এবার যেনো মুশকিলে পড়ে গেলো। চিন্তিত হয়ে বলল,

— তাহলে তুমি যাবে কোথায়?

রাজকন্যা বলল,

— কেনো? তোমাদের বাড়ি।

কথা শুনে কাঠুরের ছেলে তো ভীষণ অবাক। বিস্মিত হয়ে সে বলল,

— আমাদের বাড়িতে ঘর তো মাত্র দুটো। একটায় বাবা আর মা থাকে। আর অন্যটায় আমি থাকি। দাদী থাকে ছাগলের ঘরে। তাহলে তুমি থাকবে কোথায়?

ফিক করে হেসে রাজকন্যা বলল,

— আমি তোমার ঘরে থাকবো।

ছেলেটা ঢোক গিলে বলল,

— তাহলে আমি কোথায় থাকবো?

রাজকন্যা তামাশা করে বলল,

— তুমি তোমার দাদীর সাথে ছাগলের ঘরে থাকবে।

কথাটা বলেই রাজকন্যা হি হি করে হাসতে লাগল।

ছাগলের ঘরে থাকার কথা শুনে ছেলেটার মন খারাপ হয়ে গেলো। মুখ কালো করে বলল,

— ছাগলের ঘরে খুব গন্ধ।

মাথা দুলিয়ে রাজকন্যা বেশ খানিক্ষণ হেসে নিয়ে বলল,

— চিন্তা করো না। ছাগলের ঘরে তোমাকে থাকতে হবে না। তোমার ঘরেই আমি আর তুমি একসাথে থাকবো।

কাঠুরের ছেলে এবার তো একেবারে আকাশ থেকে পড়লো। ভয়ে শিউরে উঠে বলল,

— ওরে বাবা। মেয়ে মানুষ সাথে নিয়ে এক ঘরে থাকলে মানুষ খারাপ বলবে।

ছেলেটি এখনও তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারেনি দেখে রাজকন্য অবাক হয়ে বলল,

— আহা খারাপ বলবে কেনো। তোমার মা কি তোমার বাবার সাথে থাকে না?

ছেলেটা আমতা আমতা করে বলল,

— আমার মা তো আমার বাবার ...

ছেলেটা কথা শেষ করতে পারছে না দেখে রাজকন্যা নিজেই বলে,

— বউ। তাই তো।

ছেলেটা লাজুকভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে,

— হু।

রাজকন্যা আবারো একটু হেসে নিয়ে বলে,

— আমিও তোমার বউ হবো।

কথা শুনে কাঠুরের ছেলের দেহ-মন ভীষণভাবে শিহরিত হলো। ঝড়ো রাতে বজ্রপাতের মতোই তার কানে বিঁধলো যেনো রাজকন্যার কথাটা। তারপর চিড়ে ফেড়ে তার কানের পর্দা ভেদ করে প্রচন্ড জোরে যেনো আঘাত করলো তার সহজ-সরল মনে। ভীষণ আবেগে চোখ বুজে ফেলে সে। যে খুশির বান তার হৃদয়ে বয়ে যাচ্ছে খোলা চোখে তা সহ্য করার ক্ষমতা তার নেই। চোখ খোলা থাকলে বাস্তব জীবনটা সামনে ভেসে ওঠে। নিজেকে তখন কাঠুরের ছেলে ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না সে। আর কাঠুরের ছেলে হয়ে রাজকন্যাকে বউ করে ঘরে তোলার চিন্তাই করা যায় না। চোখ বন্ধ করলে নিজের বাস্তব পরিচয় ভুলে রুপকথার কোনো প্রেমের গল্পের নায়ক বলে মনে হয়। তখন রাজকন্যা তো কি পরীর দেশের রাণীর সাথে প্রেম করতেও আর বাধে না। চোখ বুজে রুপকথার সেই সব কাহিনীর কোনো একটাতে নিজেকে আর রাজকন্যাকে নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় বসিয়ে মনে মনে বেশ কিছুক্ষণ তাকে নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা করে কাঠুরের ছেলেটা। মায়াবী এক আনন্দে তার চোখ মুখ জ্বলজ্বল করে ওঠে। কিন্তু চোখ খোলার সাথে সাথেই তার মনটা আবার বিষণ্ন হয়ে যায় মুখটা হয়ে যায় কালো। তার মনে পড়ে যায় বাস্তবে সে এক কাঠুরের ছেলে। কোনো রাজকন্যা তার বউ হতে পারে না। মনটা তখন ভীষণ খারাপ হয়ে যায় তার। রাজকন্যা অবাক হয়ে বলে,

— কি ব্যাপার। আমি তোমার বউ হবো শুনে মনটা খারাপ করে ফেললে যে। তাহলে কি আমাকে তোমার পছন্দ নয়?

মাথা নেড়ে ছেলেটা বলল,

— না, না। পছন্দ তো ঠিকই। কিন্তু তুমি রাজকন্যা আর আমি কাঠুরের ছেলে। আমার বউ হওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি তোমার স্বামী হওয়ার যোগ্য নই। তুমি নিশ্চয়

আমার সাথে তামাশা করছো। ভালবাসার নামে ছলনা করছো।

রাজকন্যা তাকে বুঝিয়ে বলল,

— এটা ছলনা নয়। দেখো তুমিই আমাকে উদ্ধার করেছো। বীরত্ব আর সততার গুণে আমার মনটাকে দখল করে নিয়েছো। অতএব, তুমিই আমার স্বামী হওয়ার যোগ্য।

ছেলেটা তবু মাথা নেড়ে বলল,

— মিথ্যা কথা। আমি বিশ্বাস করি না। দোহাই তোমার আমাকে অকারণে আশা দিয়ো না। ভালবাসার নামে ছলনা করে আমার সহজ-সরল মনে ব্যথা দিয়ো না।

রাজকন্যা বলল,

— এটা ছলনা নয়। সত্যিকারের প্রেম। এসো আমি তোমাকে প্রমাণ দেবো।

ছেলেটা অবাক হয়ে বলল,

— প্রমান দেবে? কিভাবে?

রাজকন্যা তার ডান হাতটি ধরে বলল,

— এসো আমার সাথে।

ছেলেটা সুবোধ বালকের মতো তার সাথে তার লুকাবার জায়গায় চলে গেলো। সেখানে গিয়ে রাজকন্যা কাঠুরের ছেলেকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলো। তারপর তার দুই গালে আর চোখে মুখে নিজের নরম দুটি ঠোঁট বুলিয়ে দিতে লাগলো। কাঠুরের ছেলেও সত্যিকারের প্রেমের প্রমাণ পেয়ে রাজকন্যাকে নিজের বুকের সাথে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো। আদর সোহাগে তার মনটাকেও ভরিয়ে দিলো সে। এখন আর কোনো ভয়-ভীতি বা সংকোচ অবশিষ্ট থাকলো না তার মনে। শত্রুপক্ষ যখন দূর্গের দরজাই খুলে দেয় তখন সাথে সাথে হামলা করে দূর্গ দখল করে নিতে আর দেরি কিসের! এমন ঘটনাই ঘটলো সে রাতে। মান-মর্যাদা আর গর্ব অহংকার ভুলে কাঠুরের ছেলের হাতে নিজের সুন্দর দেহটাকে সম্পূর্ণ সঁপে দিলো রাজকন্যা। খুলে দিলো নিজের মনের দ্বার। আর বীর পুরুষের মতোই সকল ভয়-ডর ভুলে কাঠুরের ছেলেটা সম্পূর্ণ দখল করে নিলো তার দেহ মন। রাজকন্যার সাথে গভীর এক প্রেম খেলায় লিপ্ত হয়ে গেলো সে।

আবেগের অতিসহ্যে কেউ আর কাউকে বাধা দিলো না। সে রাতে শেষ হয়ে গেলো রাজকন্যার কুমারী জীবন। অবশেষে ক্লান্ত দেহে দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। সকাল হলে ঘুম থেকে উঠে রাজকন্যা দেখলো তার বুকের উপর যে শুয়ে আছে সে কাঠুরের ছেলে নয় বরং সত্যিকারের রাজপুত্র। বিস্ময়ে সে তো হতবাক। ততক্ষণে রাজপুত্রের ঘুমও ভেঙে গেলো। সুবহে সাদিকের পরেই তার রুপ পাল্টে গেছে। এখানে সে কিভাবে এসেছে আর কি করেছে কিছুই আর স্মরণ নেই তার। কাঠুরের ছেলে মনে করার পরও গত রাতে রাজকন্যা তার সাথে কি যে মধুর খেলা করেছে সেটাও মনে পড়ে না তার।

ওদিকে নকল রাজপুত্রের রুপও আসল কাঠুরের ছেলের মতো হয়ে গেলো। রাজপুত্রের ঘরে তাকে পেয়ে সৈন্যরা তাকে বন্দি করলো। তারা ভাবলো সে ডাকাতি করতে রাজপুত্রের ঘরে ঢুকেছে। পরে রাজপুত্রকে হত্যা করে কোথায় ফেলে দিয়েছে। ঠিক হলো তাকে হত্যা করা হবে। ভয়ে তখন সে সব কথা স্বীকার করলো। তার জাদুকরী দাদীর কথাও বলে দিলো। শেষে সৈন্যরা সেই বুড়ির বাড়ি হাজির হলো। বুড়ি তখন সব ঘটনা স্বীকার করলো। আর রাজপুত্রের কাছে ক্ষমা চাইলো। রাজপুত্র বলল,

— ক্ষমা তোমাকে করতে পারি যদি আমার কাঠুরে অবস্থার প্রেমের স্মৃতি তুমি জাদু করে ফিরিয়ে আনতে পারো।

বুড়ি বলল,

— সেটা করতে হলে, দুনিয়ার সাতটি মহাদেশ থেকে সাত রকমের দুষ্প্রাপ্য ফল আমাকে এনে দিতে হবে।

অনেক কষ্ট করে রাজপুত্র সেই সব ফল এনে দিলো। আর বুড়ি তার রস দিয়ে একটা শরবত বানিয়ে দিলো। সেই শরবত পান করে রাজপুত্রের প্রেমের স্মৃতি ফিরে আসলো। সে কাঠুরের ছেলে জেনেও কৃতজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে রাজকুমারী তাকে কেমন ভাল বেসেছিলো এটা জেনে তার দেহমনে এমন এক শিহরন খেলে গেলো যে, তার মনে হলো, সারাটা জীবনে আর কখনও এত তৃপ্তি সে পায়নি। তারপর রাজকন্যার সাথে বাসর হলো তার। ভীষণ আবেগে নববধুকে আলিঙ্গন করলো রাজপুত্র। রাজকন্যাও তাকে জড়িয়ে ধরলো পরম সুখে। তার স্বামী যে কাপুরুষ নয় বরং সেই যে আসলে

তাকে ডাকাত দলের হাত থেকে উদ্ধার করেছে আর প্রেমও হয়েছে তারই সাথে এসব ভেবে তার প্রতি মনটা তার মমতায় বিগলিত হলো। সে রাতেও একে অপরকে উপভোগ করলো তারা। পরম তৃপ্তিতে ভরে গেলো দুজনের দেহ মন। রাজপুত্রের তবু মনে হতে লাগলো, জঙ্গলের সেই রাতের কথা। তার মনে হলো, এমন হাজারটা বাসর রাতের চেয়ে তা অধিক মধুর। অধিক উপভোগ্য। সে ভাবলো,

— হাই! যদি সকল ধন-সম্পদের বিনিময়ে হলেও আমি ঐ রাতটা আরেকবার ফেরত পেতাম।

বানু দাদী গল্প শেষ করলেন। আশে-পাশের খুদে স্রোতারা গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে অনেক আগেই। তবু গল্প বলা চালিয়ে গেছেন তিনি। তিনি জানেন তার গল্পের অদৃশ্য এক শ্রোতা আছে। ঘর থেকে কান খাড়া করে গল্পের প্রতিটা কথা যে গোগ্রাসে গিলছে। তার বয়সের দিকে খেয়াল রেখেই তিনি গল্পের শেষের দিকটা সাজিয়েছেন। ইচ্ছা করেই বলেছেন কিছু কিছু শব্দ কিছু কিছু বাক্য। গল্পটা শেষও করেছেন গৎবাঁধা নিয়মের বাইরে। তিনি বলতে পারতেন, তারপর রাজকন্যাকে নিয়ে সেই রাজপুত্র সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে লাগলো। রুপকথার কাহিনীর এটাই সাধারণ নিয়ম। তার বদলে তিনি রাজপুত্রের মনে ঢুকিয়ে দিয়েছেন ছেড়ে আসা অতীতকে ফিরে পাওয়ার আক্ষেপ। অতৃপ্ত রেখেছেন তার মন। অসম্পুর্ন রেখেছেন যেনো কাহিনীটা। গল্প বলার জাদুকরী বুড়ি তিনি। কোন কথায় যে কার মনে কালবৈশাখী ঝড় উঠে যাবে বিলক্ষণ জানা আছে তার।

বানু দাদীর গল্প শুনে মজিদের মনে সত্যি সত্যিই কালবৈশাখী ঝড় উঠে গিয়েছিলো। গল্পটা যে অসম প্রেমের বা কাহিনীটা যে অসম্পুর্ন কেবল একারণে নয়। গল্পের মধ্যে নিজের অজান্তেই মজিদের জটিল ও কঠিন একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছেন বানু দাদী। এই গল্প থেকে জান্নাতে অসম প্রেমের অস্তিত্ব প্রমাণ করার একটা সূত্র আবিষ্কার করেছে সে। যেভাবে আপেল নিচে পড়তে দেখে নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সূত্র আবিষ্কার করেন। গল্পটা বলে বানু দাদী মজিদের দিকে টাটকা একটা আপেলই যেনো ছুঁড়ে দিয়েছেন। যে প্রশ্নের উত্তর এ যুগের মুফতি মুহাদ্দিসরা দিতে পারেনি বানু দাদী সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছেন। কত বড় কাজ যে তিনি করেছেন তা তিনি নিজেই জানেন না, জানতেও পারবেন না কখনও। যেভাবে নিউটনের সেই আপেল গাছটি কোনো দিন

জানতে পারেনি মানবতার কত বড় উপকার সে করেছে।

বানু দাদীর এই গল্প থেকে শিক্ষা নিয়েছে মজিদ। যারা জান্নাতী হবে তারা সবাই হবে একেকজন রাজা। নিজের জান্নাতের সকল কিছুই থাকবে তার হাতের মুঠোয়। সুন্দরী সব হুর-পরীরা নিজেদের জীবন যৌবনকে তার নিকট সঁপে দেওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত থাকবে। এমন পরিবেশে অসম প্রেমের কোনো সুযোগ নেই বটে। কিন্তু এর মধ্যে অল্প একটু নাটকীয়তা যোগ করলেই সব মুশকিল আসান হয়ে যায়। সমাধান হয়ে যায় মজিদের প্রশ্নের। মজিদ ভাবে, যখন তারই মতো কোনো প্রেম পাগল জান্নাতে গিয়ে মহান আল্লাহর নিকট জিদ ধরে বলবে,

— আমার রব, আমি প্রেম করতে চায়। রুপকথার মতো অসম প্রেম। হতদরিদ্র এক রাখালের বেশে আমি জয় করতে চায় কোনো রাজকুমারী বা ধনীর দুলালীর মন। বুদ্ধি খাটিয়ে নানা কৌশলে অহংকারী আর তেজী সব কিশোরী আর তরুণীদের গর্ব অহংকারের প্রাচীর ভেঙে চুরমার করে প্রেমের ফাঁদে ফেলে তাদের জীবন আর যৌবনক জবর দখল করতে চাই।

মহান আল্লাহ হয়তো তখন বলবেন,

— এই যে দেখো কত সুন্দরী সব হুর-পরী তোমার অধীনে রয়েছে। সবাই তোমার হুকুমের গোলাম। অতএব এত কষ্ট তোমার করার প্রয়োজন কি? দুনিয়ার জীবনে যথেষ্ট কষ্ট করেছো তুমি। জান্নাতে আসার পর তোমাকে কোনো কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা নেই আমার।

সেই পাগল তখন নাছোড়বান্দা হয়ে বলবে,

— হে আমার প্রভু, অমন একটা অসম প্রেমের স্বাদ পাওয়ার জন্য কষ্ট যা হয় তা করতে রাজি আছি আমি।

মজিদ ভাবে,

— মহান আল্লাহ তখন জান্নাতের মধ্যে একটা এলাকা তৈরী করবেন। আর সে এলাকাকে সাজাবেন কোনো একটা রুপকথার কাহিনীর প্রেক্ষাপটে। যেভাবে অনেক সময় ঐতিহাসিক সিনেমা তৈরী করার জন্য কোনো এলাকাকে হাজার বছরের পুরোনো

সাজে সজ্জিত করা হয়। বাড়ি ঘর, রাস্তা-ঘাট, যানবাহন, মানুষের বেশ-ভূষা ইত্যাদি সব কিছু হয় ঐ যুগের স্টাইলে। যা দেখে দর্শকের মনে হয় সে যেনো হাজার বছর আগের দুনিয়ায় ফিরে গেছে।

বানু দাদীর বলা গল্পটার কথাই ধরা যাক। হয়তো কয়েকশ বছর আগে রাজ-রাজাদের সময় দুনিয়ার রুপ যেমন ছিলো তেমনিভাবে জান্নাতের একটা এলাকাকে সাজানো হলো। সেখানে জঙ্গল থাকলো, রাজ প্রাসাদ থাকলো আর থাকলো পরমা সুন্দরী এক রাজকন্যা। তারপর ঐ প্রেমের পাগলকে কুঠার হাতে, কাঠুরের বেশে ঐ এলাকায় ছেড়ে দেওয়া হলো। তার আগে সে যে জান্নাতের রাজা বা তার আসল পরিচয় কি তা সাময়িকভাবে ভুলিয়ে দেওয়া হলো। এই অবস্থায় তাকে ওখানে ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ হয়তো বললেন,

— নাও হে আদম সন্তান। হাতের নাগালে এত কিছু পেয়েও যখন তোমার স্বাদ মেটে না তখন কাঠুরের বেশে এই রাজ্যের রাজকুমারীর মনটাকে জয় করে অসম প্রেমের স্বাদ গ্রহণ করো।

তারপর নিজেকে মনে প্রাণে একজন কাঠুরিয়া মনে করেই ঐ পাগলের কাহিনীটা শুরু হলো। পরে ধীরে ধীরে তা ঐ রাজকুমারীকে ডাকাতদের হাত থেকে উদ্ধার করা এবং তার মনটাকে জয় করে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করার ঘটনা ঘটলো। শেষে তাকে উপভোগও করতে পারলো গল্পের কাহিনীর মতো করেই। সব শেষে মহান আল্লাহ তাকে তার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। ফিরিয়ে দিলেন তার পূর্বের স্মরণ শক্তিটাও। তবে কাঠুরের বেশে রাজমুকারীর সাথে যে অসম প্রেমের স্বাদ সে পেয়েছে সেই স্মৃতিটাও তার মনে থেকে গেলো বাস্তব ঘটনার মতোই। যেভাবে স্বপ্নে কোনো পরমা সুন্দরী মেয়ের সাথে সহবাস করলে ঘুম থেকে ওঠার পরও তার স্মৃতি অন্তরে বাস্তব জীবনের মতোই জাগরুক থাকে।

মজিদ ভাবে,

— এতে অসম্ভবের কি আছে?

হাদীসে তো বলা হয়েছে জান্নাতে বান্দা যা চাইবে তাই পাবে। এমনকি হাজার রকমের খাবার-দাবার থাকা স্বত্ত্বেও কেউ চাষ করতে চাইলে তাও করতে পারবে। এসব হাদীস

পাঠ করে মজিদের মনে হয়, তার মতো প্রেম পাগল লোক জান্নাতী হয়ে যদি অমন একটা আবদার করেই বসে তবে মহান আল্লাহ তা অবশ্যই বাস্তবায়ন করবেন। অন্য একটা হাদীসের মূল ভাব থেকে বিষয়টি আরো সুন্দরভাবে বুঝে নেওয়া যায়। হাদীসে বর্ণিত আছে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতে একটা বাজার থাকবে। সেখানে কোনো বেচা-কেনা থাকবে না। সেখানে কিছু সুন্দর সুন্দর নারী ও পুরুষের ছবি থাকবে। জান্নাতী ব্যক্তি যে চিত্রকে পছন্দ করবে সে তার মধ্যে ঢুকে যাবে। অর্থাৎ তার রুপটা সেই ছবির মতো হয়ে যাবে।

মজিদ ভাবে,

— সে যুগে কেবল চিত্র ছিলো তাই হাদীসে কেবল চিত্রের কথা বলা হয়েছে। তখন চলচিত্র ছিলো না তাই চলচিত্রের কথা বলা হয়নি। যেমন পোলাও-কর্মা, চমচম-রসোগোল্লা ইত্যাদি খাবারের কথাও বলা হয়নি। কারণ তখনও আরবে এমন খাবারের প্রচলন ছিলো না। এর অর্থ এই নয় যে জান্নাতে এসব খাবার থাকবে না। আসলে এর সবই জান্নাতে থাকবে। সে যুগের মানুষদের বোঝানোর সময় তারা যা বোঝে সে অনুযায়ীই কথা বলা হয়েছে। আর সাধারণভাবে বলা হয়েছে, জান্নাতে মানুষ যা কিছু আশা করে বা স্বপ্ন দেখে তার সবই থাকবে। এমনকি একথাও বলা হয়েছে যে, সেখানে এমন জিনিসও থাকবে যা কোনো চোখ কখনও দেখেনি, কোনো কান কখনও শোনেনি এমনকি কোনো অন্তর কখনও কল্পনাও করেনি। এ হিসেবে হাদীসে কেবল চিত্রের মধ্যে প্রবেশ করার কথা বলা হলেও সেখানে চলচিত্রের মধ্যে প্রবেশ করার ব্যবস্থাও যে থাকবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আর সেই চলচিত্র নিশ্চয় দুনিয়ার এই চলচিত্রের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত হবে। তার মধ্যে একজন মানুষ নিজেই নায়ক সেজে অভিনয় করতে পারবে চলচিত্রের কল্পিত ছায়া নায়িকা ও অন্যান্য চরিত্রের সাথে। কোনো ব্যক্তি কোনো চলচিত্রের মাঝে ঢুকে যাওয়ার সাথে সাথেই নিজের আসল পরিচয় ভুলে সে ঐ কাহিনীর পরিচয়েই নিজেকে চিনবে। কাহিনীর পরতে পরতে সে বিচরণ করতে পারবে। স্বপ্নের মতো কল্পিত সব ছায়া চরিত্রগুলোর সাথে মানুষের মতোই কথা বলতে পারবে ও তাদের সাথে সম্পর্ক ও সদ্ভাব স্থাপন করতে পারবে। কাহিনীর নায়িকার সাথে গড়ে তুলতে পারবে প্রেমের সম্পর্ক এবং শেষে তাকে মনের মতো করে উপভোগও করতে পারবে। অনেকটা কোনো থ্রী ডি ভিডিও গেমের মাঝে নায়কের ভূমিকায় ঢুকে যাওয়ার মতো।

কিন্তু জান্নাতে বিষয়টা হবে আরও উন্নতমানের। ফলে বাস্তব জীবনের সাথে তার কোনো পার্থক্য থাকবে না। সব জিনিস হাতে ধরা যাবে, ছুঁয়ে দেখা যাবে, খেয়ে স্বাদ নেওয়া যাবে ইত্যাদি। সেখানে অর্জন করা যাবতীয় স্মৃতিও তাই বাস্তব জীবনের মতোই স্মৃতির পাতায় গেঁথে যাবে। ঐ সিনেমার প্রেক্ষাপট থেকে বের হয়ে বাস্তব জীবনে ফিরে আসার পরও তার দৃশ্যগুলো স্মৃতির পাতায় আয়নার মতো ঝকঝক করতে থাকবে। অনেক সময় কিছু কিছু স্বপ্ন যেভাবে অন্তরে গেঁথে যায়।

মজিদ ভাবে,

— তবে তো যে কোনো রুপকথার কাহিনীর মাঝে নায়ক হিসেবে ঢুকে পড়া যাবে। যত গল্প কথা শুনে সে রোমাঞ্চিত হয়েছে নিজেই স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হয়ে তা স্বচক্ষে দেখতে পারবে এবং স্বশরীরে উপভোগ করতে পারবে। আরো কত সুন্দর সুন্দর কাহিনী হয়তো মহান রব্বুল আলামীন নিজের পক্ষ থেকে রচনা করে রাখবেন। যার সৌন্দর্য হবে অতুলনীয় এবং যাতে ভোগ-উপভোগ ও রোমাঞ্চের পরিমাণ হবে হাজার হাজার গুণ বেশি।

আর্কিমিডিসের ইউরেকা বলার মতোই অনেকটা স্বয়ংক্রীয়ভাবেই মজিদ বলে ওঠে।

— কেল্লা ফতে।

এতদিন ধরে অন্তরে পুশে রাখা প্রশ্নটা তার আজ সমাধান হয়ে গেছে। আবিষ্কৃত হয়ে গেছে জান্নাতে বসে দুনিয়ার সব রুপকথার প্রেমকাহিনীগুলো নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করার পদ্ধতি। শেষ হয়েছে জান্নাত সম্পর্কে তার বহু দিনের গবেষণা। সে এই গবেষণার নাম দেয় “জান্নাতী দুনিয়ার অসম প্রেম”। এখন সে লাবণী বা তার মতো যত মেয়ে দুনিয়াতে আছে তাদের কথা ভুলে যায়। আর তাদেরই মতো নারী চরিত্রের সাথে জান্নাতের দুনিয়ায় প্রেম করার স্বপ্ন দেখে। সে জানে, এই প্রেমে ছেকা খাওয়ার কোনো ঝুঁকি নেই। মনটা তার তাই ধীর-স্থির হয়ে যায়। মজিদের বাবার চোখেও সেদিন থেকে তার পাগল ছেলেটা ভাল হয়ে যায়।

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে কোনো ছলনাময়ী নারীর পিছনে দৌঁড় ঝাপ না করে এখন সে নির্জনে একাকী বসে ভাবে তার জান্নাতী দুনিয়ার প্রেমিকাদের কথা। কল্পনায় রচনা করে চলে কত শত মন মাতানো প্রেম কাহিনী। সেসব কাহিনীতে নিজের নাম, পেশা,

ভূমিকা কি হবে সবই নিজের মতো করে ঠিক করে নেয়। কখনওবা রাখাল ছেলে বাবুল আবার কখনও কাঠুরের ছেলে হোসেন। বয়স হয় কখনও দশ/বারো আবার কখনও বিশ/বাইশ। বিপরীতে তার প্রেমিকা হয় কখনওবা ধনীর দুলালী চঞ্চল এক কিশোরী আবার কখনও পরমাসুন্দরী এক শাহজাদী। প্রেক্ষাপট হয় কখনও গাঁও গ্রামের এক শিমুল তলা আর তারই পাশের সবুজে ঢাকা পুকুরপাড়। আবার কখনও পূর্ণিমা চাঁদের আলোই ঝলমল করতে থাকা জঙ্গল আর তার সাথে সংলগ্ন খোলা মাঠ। কিংবা কোনো পাহাড়ের গুহা। নিজের ইচ্ছামতো যা খুশি কল্পণা করে মজিদ। আর আল্লাহর কাছে দোয়া করে যেনো জান্নাতী হয়ে সে তার এই সব স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারে।

তিন.

বিকাল বেলা। আসরের নামাজ পড়ে বাড়ি ফিরে এলো মজিদ। রাস্তা দিয়ে আসার সময় সে দেখলো খেলার মাঠে তার বন্ধুরা হৈচৈ করে ক্রিকেট খেলছে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে হনহন করে হেঁটে বাড়ি ফিরে এলো সে। ছাগলগুলো নিয়ে মাঠে চলে গেলো চরাতে। সাথে একটা বই নিলো পড়ার জন্য। এটা তার নিয়মিত অভ্যাস। ছাগলগুলোকে খোলা মাঠে ছেড়ে দিয়ে মোড়লদের পুকুরপাড়ে ছায়া ঢাকা পরিবেশে বইটা খুলে মাথা নিচু করে বসে পড়লো সে। বইয়ের পাতায় দুয়েকটা লাইনে চোখ বুলাতে না বুলাতেই তার মাথায় অসম্ভব সুন্দর একটা প্রেমের কাহিনী হঠাৎ যেনো গজিয়ে উঠলো। কাহিনীর প্রেক্ষাপট হবে এই পুকুড়টা, পুকুরের পাড়ে দাড়িয়ে থাকা লাল ফুলের অলংকারে মোড়া শিমুল গাছটা আর পূর্ব কোনের ঐ ঘনো ঝোপটি। বাকিটা তাকে কল্পনা করে নিতে হলো। সে কল্পনা করলো, এই পুকুর থেকে একটু দূরে গাছ-গাছালির আড়ালে অদৃশ্য একটা দো-তলা বাড়ির ধনী আর অহংকারী সব বাসিন্দাদের। তারই মাঝে বিশেষভাবে যেনো গড়ে নিলো নিজের প্রেমিকার চরিত্রটি। অনেক ভেবে নিজের নাম দিলো বাবুল আর তার নায়িকার নাম দিলো রুপা। তারপর মনে মনে রচনা করে নিলো রাখালের ছেলে বাবুলের সাথে ধনীর দুলালী রুপার মন মাতানো প্রেম কাহিনী। সব কাজ মোটামুটি সম্পন্ন হয়ে গেলে নিজের মনের পর্দাকে সিনেমার পর্দা বানিয়ে তারই উপর একের পর এক ফুটিয়ে তুলতে লাগলো কাহিনীর প্রতিটি দৃশ্য।

১.

মজিদ ভাবে, হাজার হাজার গোনার পাহাড় ক্ষমা করে সামান্য কিছু নেক আমল যা ছিলো তারই ওসীলায় মহান রব্বুল আলামীন নিজের দয়ায় তাকে জান্নাতবাসী করেছেন। মজাদার সব খানা-পিনা, সুন্দরী হুর-পরী ইত্যাদি সকল নেয়ামতের মাঝে ডুবে থেকে বহু সময় যেনো পার হয়ে গেছে। হঠাৎ একদিন তার মনে হলো,

— দুনিয়াতে তো পড়েছিলাম, জান্নাতে একটা বাজার থাকবে। সেখানে থাকবে সুন্দর সুন্দর সব জিনিস। যাই, সেখান থেকে একটু ঘুরেই আসি।

যেই ভাবা সেই কাজ। সিংহাসন থেকে উঠেই

— পঙ্খীরাজ

বলে ডাক দিতেই শাঁ করে কোথা থেকে একটা পাখা ওয়ালা লাল ঘোড়া ছুটে এসে বলল,

— সালাম জাহাপনা।

মজিদ তার ঘাড়ের কেশর ধরে হালকাভাবে লাফ দিতেই পাখির পালকের মতোই উড়ে গিয়ে বসে পড়লো তার মোলায়েম পিঠের উপর। তারপর গন্তব্যের কথা জানাতেই পঙ্খীরাজ তাকে নিয়ে শাঁ শাঁ করে উড়ে যেতে লাগলো জান্নাতের বাজারের দিকে। হালকা হেসে মজিদ বলল,

— ধীরে চলো পঙ্খী। আকাশের শীতল মেঘ খন্ডগুলোকে হাতের পরশে একটু ছুঁয়ে দেখতে দাও। আর নির্মল বাতাসটাকেও একটু উপভোগ করতে দাও। চাইলে তো আমি টেলিপোর্টের মাধ্যমেও নিমিষেই সরাসরি বাজারে গিয়ে হাজির হতে পারতাম। নয় কি?

কথা শুনে পঙ্খীরাজ ভীষণ লজ্জিত হয়ে বলল,

— দুঃখিত আমার মনীব। ভুল হয়ে গেছে।

সাথে সাথেই গতি কমিয়ে দুলকি চালে চলতে লাগলো পঙ্খীরাজ। এভাবে চলা তার অভ্যাস নয়। কোনোরুপ ঝাঁকি ছাড়াই প্লেনের মতো সোজা চলাই তার উচিৎ। তার মতে তাতে সফর হয় আরও বেশি আরামদায়ক ও আনন্দময়। কিন্তু মজিদই তাকে

এভাবে দুলকি চালে চলার নির্দেশ দিয়েছে। বলেছে,

— দুনিয়ার ঘোড়াগুলো এভাবেই চলতো। এটাই নাকি বেশি ভালো।

দুনিয়াতেও ঘোড়া ছিলো এটা শুনে পঙ্খীরাজ ভীষণ খুশি হয়েছে। কিন্তু তাই বলে এভাবে দুলকি চালে চলাই যে বেশি ভাল এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না সে। তবু তাকে এভাবেই চলতে হয়। তার ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোনো মূল্য নেই এখানে। মহান আল্লাহ তাকে মজিদের হুকুম তামিলের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। এখন তাই ধীরে চলার সময় দুলকি চালেই চলে সে।

বাজারে পৌঁছেই মজিদ দেখলো সামনের খোলা ময়দানে অগনিত পঙ্খীরাজ ঘোড়া অপেক্ষমান। নাচের ভঙ্গিতে পাখা দুলিয়ে দুলিয়ে সময় কাটাচ্ছে তারা। সেই সাথে সবাই মিলে একতানে মুখ দিয়ে অতি ক্ষীণ কিন্তু অত্যন্ত শ্রুতিমধুর একটা শব্দ বের করছে। বাজারে এসে পরস্পরের সাথে মিলিত হতে পেরে তারাও যেনো আনন্দিত হয়েছে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাই একে অপরকে স্বাগত জানাচ্ছে তারা। তবে বিশৃঙ্খলা হবে ভেবে নিজের স্থান থেকে এক চুলও নড়ছে না কেউ। কানটিও খাড়া করে রেখেছে যাতে মনিবের ডাক শোনার সাথে সাথেই কাল বিলম্ব না করে তার সামনে গিয়ে হাজির হতে পারে। এক পাশে কিছু একেবারে সাধারন ঘোড়াও রয়েছে। পাখা না থাকলেও সৌন্দর্যের দিক থেকে মোটেও কম যায় না তারা। সেদিকে তাকিয়ে মজিদ হাসে। গ্রামের লোকেরা যেভাবে শহরে গিয়েও গ্রামের কথা ভুলতে পারে না। দুনিয়ার মানুষ জান্নাতে এসেও দুনিয়ার জীবনকে ভুলতে পারেনি। টেলিপোর্টিং, পঙ্খীরাজ ঘোড়া ইত্যাদি শত শত অত্যাধুনিক ব্যবস্থা থাকতেও কেউ কেউ মাঝে মাঝেই একেবারে সাধারণ ঘোড়া ব্যবহার করে। এভাবে স্বেচ্ছায় ভ্রমণটাকে দীর্ঘায়িত করে। ইচ্ছাকৃতভাবে এমন সময় নষ্ট করে মানুষ কি মজা পায় পঙ্খীরাজ তা বুঝে উঠতে পারে না। তার নিকট মনে হয় এর একমাত্র ব্যাখ্যা হলো, “মানুষ অজ্ঞ ও নির্বোধ”। মজিদ প্রতিবাদ করলে সে বলে, সে শুনেছে একথা নাকি কুরআনে আছে। কথাটা যে কুরআনে আছে সেটা মজিদও জানে। আর কথাটা সত্যিও বটে। অতএব, সে আর কথা বাড়ায় না। পঙ্খীরাজকে এমন খোলা-মেলা কথা বলার অধিকার সে-ই দিয়েছে। কেবল মনীব, জাহাপনা ইত্যাদি বুলি আওড়িয়ে অযথা সম্মান প্রদর্শন করে তার সাথে অধীনস্তরা দূরুত্ব বাড়িয়ে ফেলুক এটা সে চায় না। তার চেয়ে দুটো মনের কথা খোলা-মেলাভাবে বলে তারাও তার অন্তরঙ্গ

বন্ধুতে পরিণত হোক এটাই সে চায়।

পঙ্খীরাজ মাটিতে নামার সাথে সাথেই মজিদ লাফিয়ে মাটিতে নেমে আঙ্গুলি নির্দেশ করে তাকে কোথায় দাড়াতে হবে এটা দেখিয়ে দিয়েই দ্রুত হেঁটে বাজারের ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করলো। এদিকে পঙ্খীরাজ নির্দেশিত স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে মনের সুখে অন্যান্য পঙ্খীরাজদের সাথে নাচে গানে মেতে উঠলো। তাদের এই গানের শব্দ বিশেষ একটা তরঙ্গে উচ্চারিত হয় ফলে তা বাজারের ভিতরে প্রবেশ করে না। তার আগেই বাতাসে মিলিয়ে যায়।

বাজারে প্রবেশ করে মজিদ এদিক সেদিক ঘুরে অনেক জিনিসই দেখলো। নিজের প্রাণপ্রিয় স্ত্রী আর হুর-পরীদের কথা স্মরণ করে যার জন্য যেটা নিতে ইচ্ছা হয় সেটা নিয়ে নিলো। এখানে বেঁচা কেনা বা দরদামের কোনো হাঙ্গামা নেই। কোনো টাকাও খরচ করতে হবে না তাকে। স্ত্রী বা হুর-পরীদের শরীরে অলঙ্কারের কোনো অভাব আছে তাও নয়। তবু তাদের কথা স্মরণ করে নিজে হাতে সে যে কিছু নিয়ে এসেছে এটাই তাদের নিকট পরম পাওয়া। ইচ্ছা করলে টেলিপোর্টিং করে অলংকারগুলো নিমিষেই যার যার ঠিকানায় পাঠিয়ে দোওয়া যায়। কিন্তু মজিদ ঠিক করে নিজে হাতেই সে তা সবাইকে পৌঁছে দেবে। আপাতত তাই সেগুলো টেলিপোর্টিং করে তার মহলের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলো।

এভাবে ঘোরা-ফেরা করতে করতে বেশ খানিকটা সময় পার হয়ে যায়। তারপর হঠাৎ মজিদের মনে পড়ে সেই হাদীসটির কথা। সে পড়েছে, জান্নাতের বাজারে বিভিন্ন নারী-পুরুষের ছবি থাকবে। যার যেটা পছন্দ সেই ছবিতে ঢুকে পড়তে পারবে। অর্থাৎ তার চেহারা ঐ ছবির মতো হয়ে যাবে। কিন্তু সেটা যে কোথায় আছে তা সে বুঝতে পারে না। হাতের তালুর উপর হলোগ্রাফিক স্ক্রীনে বাজারের ম্যাপ ভাসিয়ে তুলে খুব সহজেই স্থানটি খুঁজে নিতে পারে সে। কিন্তু এটা তার পছন্দ হয় না। সে চলে যায় বাজারের দায়িত্বশীল ফেরেশতার নিকট। কাছে যেতেই ফেরেশতা তাকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। মুখে কিছুই বলে না। মজিদই তাকে প্রশ্নটা করে। ব্যাপারটা বোঝানোর জন্য তাকে একটু ব্যাখ্যা করে বলতে হয়।

— দেখো, হাদীসে এসেছে, জান্নাতের বাজারে নারী-পুরুষের ছবি থাকবে। যেমন খুশি চেহারা বদল করা যাবে ..

এতো বিস্তারিত বলার দরকার ছিলো না। হাজির হওয়ার সাথে সাথেই ফেরেশতা তার চোখের দিকে তাকিয়েই তার মনের কথা বুঝে ফেলেছে। হাট-বাজার, মিলনায়তান এবং বাসস্থানে মুমিনদের খেদমতের জন্য যেসব ফেরেশতা নিয়োগ করা হয় তাদের প্রথম শ্রেণীর মস্তিস্ক রিডিং এর ক্ষমতা থাকে। মানুষের অন্তরের গহনে কি জল্পনা-কল্পনা চলছে সেগুলো তারা বুঝতে পারে না তবে যে কথাটা তারা তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চায় সেটা বলার আগেই তারা বুঝে ফেলে। তবে মনিব বলতে থাকলে তার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে।

মজিদের প্রশ্ন শুনে, দায়িত্বশীল ফেরেশতা সহাস্যে বলে উঠলো,

— এই যে, এদিকে। আসুন আমার সাথে।

বলে সে চলতে আরম্ভ করলো। তার স্থানে সাথে সাথে দাঁড়িয়ে গেলো অন্য আরেক ফেরেশতা। মজিদ আর কথা না বাড়িয়ে তার পিছু পিছু চলতে শুরু করলো। সামান্য হাটার পরই তারা একটা বিশাল হলরুমে এসে পৌঁছালো যার চারিপাশে সুন্দর সুন্দর সব ছবি টাঙানো ছিলো। সেদিকে ইশারা করে ফেরেশতা বললো,

— এর মধ্যে যে ছবিটা আপনার পছন্দ হয় ইচ্ছা করলে আপনি তার মধ্যে ঢুকে পড়তে পারেন। হাদীসে এই জায়গার কথাই বলা হয়েছে।

ছবিগুলোর দিকে কিছুক্ষণ চোখ বুলিয়ে মজিদ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ফেরেশতার দিকে তাকিয়ে বলে,

— এর কথা হাদীসে আছে সে তো বুঝলাম। কিন্তু হাদীসে নেই এমন কি আছে সেটা বলো।

মজিদের কথার অর্থ ফেরেশতা বুঝতে পারে না। মজিদ নিজেই কথার মূল উদ্দেশ্যটি অন্তরের গহনে লুকিয়ে রেখেছে। সেই স্তরে নিয়ে আসেনি যেখানে আনলে ফেরেশতা না বললেও তা বুঝে নিতে পারতো। অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবেই মজিদ ফেরেশতাকে একটু ধাঁধায় ফেলতে চাচ্ছে। কথাটা শুনে ফেরেশতা বিস্ময় প্রকাশ করে বলে,

— কি বললেন, ঠিক বুঝলাম না।

তোমাদের না বোঝারই কথা এমন একটা ভাব করে মজিদ হালকাভাবে হেসে বলে,

— আল্লাহ বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে এমন কিছু থাকবে যা কেউ জানে না। কেউ জানে না অর্থ তা কুরআন বা হাদীসে উল্লেখ করা হয়নি। তোমার এই চিত্র তো দেখলাম। কিন্তু সেটা তো হাদীসে উল্লেখ আছে। এখন এমন কিছু দেখাও যা কোথাও উল্লেখ নেই।

ফেরেশতা এবার মজিদের কথার অর্থ বুঝতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই সে বলে,

— দেখুন না জানা জিনিস জান্নাতে প্রচুর রয়েছে। তার মধ্যে আপনি ঠিক কোনটি দেখতে চান বা কোন ধরনের জিনিস দেখতে চান তা না বললে, আমি আপনাকে কিভাবে দেখাবো?

মজিদ এবার চিন্তায় পড়ে যায়। সামনে ঝুলে থাকা ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে ছবির সাথে মিলিয়ে নতুন কোন্ জিনিস দেখার ইচ্ছা করা যায় তা ভাবতে থাকে। মুখ দিয়ে বারবার বলতে থাকে,

— ছবি, চিত্র ..

তারপর হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় ছায়াছবি বা চলচ্চিত্রের কথা। তারপর প্রবল উৎকণ্ঠায় প্রায় চেঁচিয়ে বলে ওঠে,

— পেয়েছি ..

ফেরেশতা তার দিকে তাকিয়েই তার মনের কথাটি বুঝতে পারে। তবু মজিদের কথা শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। মজিদ তার দিকে তাকিয়ে কথাটি বলতে গিয়ে যখন বুঝতে পারলো, না বললেও হবে তখন এক দিকে মাথা নাড়িয়ে বুঝিয়ে দিলো,

— ঠিকই বুঝেছো। অতএব, এখন আমাকে সেখানে নিয়ে চলো।

ফেরেশতাও মুখে কিছু বলে না। কেবল হাত দিয়ে ইশারা করে তাকে তার পিছু পিছু আসতে বলে আরেকটা গলি দিয়ে কিছুক্ষণ হেঁটে গিয়ে পৌঁছালো আর একটা বড় হলরুমে। সেখানে কোনো চিত্র ঝোলানো ছিলো না। বদলে ছিলো সারি সারি সব চেয়ার-টেবিল। চেয়ারগুলো গদি আটা আর টেবিলের উপর বড় বড় মনিটর সাইজের স্ক্রীন। অবাক হয়ে মজিদ বলল,

— এসব কি?

মুখে কোনো উত্তর না দিয়ে ফেরেশতা হাতের ইশারায় তাকে চেয়ারে বসতে বলে নিজে স্ক্রীনটা চালু করলো। সাথে সাথেই কম্পিউটারের মনিটরে যেভাবে ভিডিও ফাইলগুলো ছবি ও শিরোনামসহ সারি সারি ভেসে ওঠে তেমনই কিছু ফাইল ভেসে উঠলো মজিদের চোখের সামনে। সে লক্ষ্য করলো, একটা ছবিতে পুকুরপাড়ে দাড়িয়ে অতীব সুন্দরী একটা বালিকা ধাক্কা মেরে এক বালককে মাটিতে ফেলে দিচ্ছে আর তাদের মাঝে মাটির উপর লাল লাল ফুল সাজিয়ে একটা লাভ আঁকা রয়েছে এমন একটা দৃশ্য। তার শিরোনামে লেখা রয়েছে, পুকুরপাড়ে ঝোপের আড়ে। পাশের আরেকটা ছবিতে পূর্ণিমার গনগনে চাঁদের নিচে পরনে শাহজাদীর পোশাক আর মাথায় রাজ মুকুট পরা একটা মেয়ে হাটু গেড়ে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে আছে ছেঁড়া ফাটা জামা পরা এক যুবকের সামনে আর যুবকটি ভীষণ অভিমানে মাথা উঁচু করে তাকিয়ে আছে পূর্ণিমার চাঁদের দিকে এমন একটা দৃশ্য। তার শিরনোমে লেখা রয়েছে, রাজ দুলালী মাখলো ধূলী। অন্য এক ছবিতে চাঁদনী রাতে একটা ঝলমলে রাজপ্রাসাদের জানালা দিয়ে মাথায় মুকুট পরা একটা চাঁদের মতো সুন্দর মেয়ে তাকিয়ে আছে আর রাস্তায় তার দিকে হাত তুলে একটা হাফ প্যান্ট পরা বালক দাড়িয়ে আছে এমন একটা দৃশ্য। তার শিরোনামে লেখা আছে "রাজার বাড়ি কন্যা চুরি"। এভাবে ফেরেশতা উপর থেকে নিচে আঙ্গুল নামানোর সাথে সাথেই কত যে ছবি আর শিরোনাম চলে যাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। এসবের কাজ কি মজিদ তা বুঝে উঠতে পারে না। ফেরেশতা তাকে বুঝিয়ে বলে,

— এগুলো অনেকটা সিনেমা বা ভিডিও গেমের মতো। এখানে বিভিন্ন ছেলে-মেয়েদের প্রেম কাহিনী ভিডিও আকারে সেভ করা আছে।

তারপর একটি টুপির মতো জিনিস দেখিয়ে বলে,

— এটা মাথায় দিয়ে এই সব গেমস এর মধ্যে কোনো একটিতে হাত দ্বারা স্পর্শ করলে মুহুর্তের মধ্যে আপনি একজন চরিত্র হিসেবে এই গেমসের মধ্যে ঢুকে যাবেন। তখন এই ঘর বা এই মনিটর কিছুই আপনার চোখে পড়বে না বরং স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষ যেমন দুনিয়াতে চলাফেরা করে আপনিও এই ভিডিওর ঘটনার মধ্যে হুবহু সেভাবে চলাফেরা করতে পারবেন। নিজের ইচ্ছামতো আচরণ করতে পারবেন। কোনো কিছু কুড়িয়ে ছুঁড়ে মারা, গাছের পাতা বা ফুল ছিঁড়ে তা হাতে নেওয়া থেকে শুরু করে অন্য

আর যা কিছু বাস্তব জীবনে করা যায় তার সবই আপনি করতে পারবেন। কাহিনীর মধ্যে অনেক মেয়ের সাথে আপনার দেখা হবে। আপনি তার মন ভুলিয়ে তার সাথে প্রেম করতে পারবেন। কৌশলে তাকে গোপন কোনো স্থানে নিয়ে গিয়ে তার সাথে গোপন কোনো কাজও করতে পারেন।

গোপন কাজের কথা শুনে মজিদ ব্যাপারটায় ভীষণ কৌতুহলী হয়ে ওঠে। আরো বিস্তারিত জানার জন্য সে বুঝেও না বুঝার ভান করে বলে,

— গোপন কাজ মানে?

নির্বিকারভাবে ফেরেশতা বলে,

— সেটা আমাদের চেয়ে আপনারাই ভালো জানেন। মানুষ এমন সব উদ্ভট কাজ করে যার আগা-মাথা কিছুই আমরা বুঝি না।

সে কিছু না বুঝলেও তার কথা শুনেই মজিদ অনেক কিছু বুঝে ফেলে। শরীরটা রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে তার। ফেরেশতা বলতে থাকে,

— এভাবে একেকটা গেমসে আপনি একেক রকম জীবন উপভোগ করতে পারেন। পরে আবার গেমস শেষ হলে আপনি ঘুম থেকে জেগে ওঠার মতোই বাস্তব জীবনে ফিরে আসবেন। গেমসের মধ্যে কয়েক মাস বা কয়েক বছর সময় অতিবাহিত হয়ে গেলেও আপনার বাস্তব জীবনে অতি সামান্য পরিমাণ সময়ই অতিবাহিত হবে। তাতে আপনার রুটিনে কোনো পরিবর্তন হবে না।

সব শুনে পুরা ব্যাপারটায় ভীষণভাবে কৌতুহলী হয়ে উঠলেও মজিদের মনে যেনো কিছু সংশয় থেকেই যায়। জান্নাতের বাস্তব জীবনে এখন সে অত্যন্ত সুখময় সময় কাটাচ্ছে। এসব গেমসের কল্পিত জীবনে ঢুকে তার কেমন লাগবে কে জানে। যদি ভাল না লাগে তবে কি সে যে কোনো সময় আবারো বাস্তবে ফিরে আসতে পারবে নাকি তাকে কাহিনী শেষ করেই আসতে হবে?

প্রশ্নটা ফেরেশতাকে করতেই সে বলে,

— আপনার ভাল না লাগলে সাথে সাথেই দু'হাত তুলে বলবেন, হে আল্লাহ আমাকে তুলে নাও। তখনি আল্লাহ আপনাকে বাস্তব জীবনে ফিরিয়ে আনবেন।

এবার আর কোনো দুঃচিন্তা থাকে না মজিদের মনে। নতুন একটা জিনিসের অভিজ্ঞতা নেওয়ার জন্য তার মনটা আঁকুপাঁকু করতে থাকে।

মনিটরে ভাসমান ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে কোনটিতে ঢোকা যায় তা বাছাই করার চেষ্টা করে মজিদ। প্রথম দৃষ্টিতেই পুকুরপাড়ের দুই কিশোর-কিশোরীর দৃশ্যটি তার মনে ধরে। “পুকুরপাড়ে ঝোপের আড়ে” শিরোনামটিও তার দেহ-মনকে রোমাঞ্চিত করে। আসলে দুনিয়ার জীবনে মজিদ গ্রামে বসবাস করেছে। গ্রামের কিশোরীদের সাথেও তার রয়েছে অনেক সুখকর স্মৃতি। পুকুর-ঘাট আর ঝোপঝাড়ের সাথেও সেসব স্মৃতির সুনিবিঢ় সম্পর্ক রয়েছে। সেসব অবশ্য পাপের কথা। মহান রব সেগুলো ক্ষমা করেই তাকে জান্নাতে দিয়েছেন। মজিদ ভাবে,

— এখন যদি বৈধভাবে সেগুলো উপভোগ করা যায় তবে মন্দ কি?

এই ভেবে টুপি সদৃশ জিনিসটা মাথায় পরে বালক-বালিকার ছবির উপর আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করলো মজিদ।

সাথে সাথেই মজিদের মনে হলো, সে সুন্দর একটা পুকুরের পাড়ে দাড়িয়ে একটা লাঠি দিয়ে শিমুল গাছ থেকে লাল লাল ফুলগুলো পেড়ে কয়েকটা ছাগলকে খাওয়াচ্ছে। এখন তার বয়স তেরো/চৌদ্দ, বাড়ি এই গ্রামের মাঝের পাড়ায়, বাবা চাষাবাদ করেন আর সে ছাগল চরায়। তার নাম বাবুল। তার একটা ছোট ভাই আছে, তার নাম হাবুল। ইত্যাদি সকল স্মৃতিই তার মনে পড়লো। কিন্তু জান্নাতী জীবনের কিছুই মনে নেই তার। কেবল এতটুকু মনে আছে যে, এই জীবনের পর আরেকটা জীবন আছে। তার মনে পড়ে কে যেনো তাকে বলেছে, যদি কখনও এই জীবন ভাল না লাগে তবে দু’হাত তুলে আল্লাহকে বলতে হবে,

— হে আল্লাহ আমাকে তুলে নাও।

তখনই আল্লাহ তাকে এই জীবন থেকে সেই জীবনে তুলে নেবেন। কে যে কথাটা বলেছে তা তার মনে নেই। এটা সত্য কিনা তাও জানে না সে। এখন জানার ইচ্ছাও নেই। কারণ এই জীবনে সে ভালই আছে। এখান থেকে সে এখনই বের হতে চায় না। সব কিছুতেই ভীষণ আনন্দ পাচ্ছে সে। এই যে লাঠি দিয়ে লাল লাল ফুলগুলো পেড়ে ছাগলকে খাওয়াচ্ছে এর মধ্যেও একটা অন্য রকম আনন্দ পাচ্ছে সে। জীবনটা ভালই

কাটছে তার।

২.

দুপুরে খাবার পর বিছানায় দু'বার গড়া দিয়েই রুপার মনটা বিষিয়ে ওঠে। মা-বাবার কড়া নির্দেশ,

— প্রতিদিন দুপুরে খাবার পর ঘন্টা খানেক ঘুমাতে হবে।

তারপর বিকালে পড়তে যাওয়া, সন্ধ্যার পর বাড়িতে ফিরে কিছুটা সময় পড়াশুনা আর বাকিটা সময় টিভি দেখে কাটিয়ে রাতে আবারও ঘুমিয়ে পড়া। সারাটাদিন এভাবে রুটিন মেনে চলতে চলতে তার মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। বারো/তোরো বছরের একটা কিশোরীর মন আর কতটাই বা নিয়ম মাফিক চলতে পারে! পাড়া-গাঁয়ে টহল দেওয়া, বান্ধবীদের সাথে খোলা ময়দানে গোল্লাছুট খেলা বা ফুল বাগানে হৈচৈ করে নাচ-গান করাই তো এ বয়সের একটা মেয়ের প্রধান কাজ হওয়া উচিৎ। তার ফাঁকে ফাঁকে হয়তো পড়াশুনা আর সেই সাথে বাবা-মায়ের কড়া কথা শোনাটা সাজে। কিন্তু খেলা-ধূলা আর হৈচৈ শিকেয় তুলে কেবলই বাবা-মায়ের হুকুম তামিল করার মতো বিরক্তিকর কাজ আর কতক্ষণই বা করতে ভাল লাগে! মাঝে মাঝে সে তাই সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে নিজস্ব পন্থায় কিছুটা হাওয়া বদলের চেষ্টা করে। রান্না ঘরের পাশের যে পুরোনো ঘরটায় মনিরা নামের কাজের মেয়েটা থাকে তারই পিছন দিকের প্রাচীরে একটা ভাঙা দরজা আছে। দরজাটা যদিও চিরকালের জন্য বন্ধ তবে একটু কষ্ট কসরত করলেই পাতলা গড়নের একটা কিশোরী অনায়াসেই তার ফাঁক দিয়ে গলে যেতে পারে। দুপুরের ঘুমের রুটিনে ফাঁকি দিয়ে মাঝে মাঝেই রুপা ঐ গুপ্ত দরজা দিয়ে বের হয়ে বাইরের জগতটা একবার দেখে আসে। গত কয়েক মাস ধরে কয়েকদিন পর পর এমন হাওয়া বদলই এখন রুপার নিয়মতি রুটিনে পরিণত হয়েছে। বাবা-মা অবশ্য ঘুর্ণাক্ষরেও টের পাননি। তবে মনিরা বিষয়টা লক্ষ্য করেছে। কয়েকবার রুপাকে সাবধানও করেছে সে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। বন্দি কবুতর যেমন খাঁচার মধ্যে ছটফট করে, বাড়ির মধ্যে রুপার অবস্থাও থাকে অনেকটা সে রকম। ঐ ভাঙা দরজা দিয়ে বাইরের হাওয়া গায়ে লাগিয়ে নেওয়ার লোভটা তাই সে কিছুতেই সামলাতে পারে না। জোর করে মনিরাকেই বরং সে মাঝে মাঝে সাথে নিয়ে যায়। ভীষণ জেদ মেয়েটার। সাথে যেতে হবে এমন

গোঁ ধরলে তার সাথে না গিয়ে আর কোনো উপায় থাকে না মনিরার। যেতে তার ভালও লাগে। বয়সে রুপার চেয়ে কয়েক বছরের বড় হলেও এ বাড়িতে তার সাথেই কিছুটা ভাব আছে তার। বাড়ির মালিক আর মালকীনের সাথে কেবল হুকুম তামিলের সম্পর্ক। তাই তাদের সাথে আলাপ-চারিতা জমে না মোটেও। রুপাও যে খুব সাদাসিধে মনের মানুষ তা মোটেও নয়। বাবা-মায়ের অঢেল সম্পদ আর সামাজিক অবস্থানের প্রভাব তার উপরও আছে। সেই সাথে আছে রুপার মতোই ঝকঝকে সুন্দর দেহখান। সবে মিলে অহংকারী সেও বটে। নিজেকে সে রাজকুমারী বলেই মনে করে। বান্ধবীদের অনেকেই তাকে এই নামেই ডাকে। মনিরাও ডাকে মাঝে মাঝে। মেজাজও তার রাজকুমারীর মত। একটু রেগে গেলেই কাজের বেটি, হা-ভাতে, ফকিরনী ইত্যাদি শোভন গালের পাশাপাশি এমন শব্দও মাঝে মাঝে প্রয়োগ করে যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সেসব শব্দ যতটা খারাপ মনিরার অবশ্য শুনতে ততটা খারাপ লাগে না। রুপার মার কাছ থেকে শুনতে শুনতে ওসব তার মুখস্ত হয়ে গেছে। সয়েও গেছে অনেকটা। তাছাড়া বেঁচে থাকতে হলে কথা বলার লোকও একটা দরকার। এসব গাল-মন্দ উপেক্ষা করেই তাই সে রুপার সাথে যতটা সম্ভব ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করে। ভাল-মন্দ কথা যতটুকু মনিরার হয় তা ঐ রুপার সাথেই। একারণেই তার অনেক অন্যায় আবদারও রাখতে হয় তাকে। মালিক পক্ষকে চটিয়ে চাকুরী খোয়ানোর মতো ঝুঁকিও নিতে হয় মাঝে মাঝে। এই গুপ্ত দরজা দিয়ে পারাপার করাটা তেমনই একটা ব্যাপার। রুপার বাবা-মা মনে করে ধনী লোকের মেয়ে হিসেবে পাঁড়া গাঁয়ের ছেলে-মেয়েদের সাথে মেলা-মেশা বা খেলা-ধূলা কোনোটিই রুপার জন্য সাজে না। খেলা-ধূলা যতটা করার সে স্কুলে গিয়ে ধনী লোকের ছেলে-মেয়েদের সাথেই করবে। এই দরজা পারাপারের বিষয়টি সে হিসেবে বর্ডার ক্রসিংয়ের মতোই ঝুঁকিপূর্ণ। রুপার আবদারে মাঝে মাঝে এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজেও অংশগ্রহণ করতে হয় মনিরার। বেশিরভাগ দিনই অবশ্য মনিরার কোনো না কোনো কাজ থাকে তাই রুপার সাথে তার যাওয়া হয়ে ওঠে না। সেক্ষেত্রে সে রুপাকে নিরাপদে পার হয়ে যেতে সাহায্য করে। বলাবাহুল্য যে, এ বাড়ির আইনে এটাও বড় মাপের অপরাধ। এই অপরাধে তারা দুজনেই সমানভাবে জড়িত। এটা গোপন রাখার মধ্যে তাই উভয়েরই স্বার্থ রয়েছে। গোপন তারা রেখেছেও। বেশ কিছুদিন থেকে রুপার যখন মন চায় তখনই গুপ্ত দরজা দিয়ে বাইরে চলে যায়। এই গুপ্ত দরজা দিয়ে পারাপারের মাঝে যেনো গোপন কোনো মজা আছে। যখনই বাইরে যাওয়ার

ব্যাপারটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে রুপা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। আজও বিছানায় দু'বার গড়া মারার সাথে সাথেই তার মনের মধ্যে বাইরের জগতটাকে দেখার একটা অদম্য ইচ্ছা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বাবা বাড়িতে নেই, মা-ও আশেপাশে কোথাও নেই। দরজার গোড়ায় আছে কেবল মনিরা। অতএব, রুপার ইচ্ছা পূরণে কোনো বাধাই নেই। অনেকটা স্বয়ংক্রীয়ভাবেই সে বিছানা ছেড়ে চুপি চুপি মনিরার ঘরের দিকে চলে গেলো। তারপর মনিরার ঘরের খোলা দরজাটি বা ঘরের মেঝেতে শুয়ে থাকা স্বয়ং মনিরার অসার দেহটির দিকে সামান্যও ভ্রূক্ষেপ না করে সরাসরি চলে গেলো পিছনের প্রাচীরের বন্ধ দরজাটার দিকে। তারপর খুট-খাট শব্দ করে সেটা সামান্য ফাঁকা করে বের হয়ে গেলো। খুট-খাট শব্দে আধা ঘুমন্ত মনিরার ক্লান্ত দুটি চোখ একবারের জন্য খুলে গিয়েছিলো। কিন্তু কি হচ্ছে তা বুঝতে পেরে আবারো চোখ বুঝে শান্ত হয়ে গেলো সে।

খাঁচায় বন্দি পাখি যেমন বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেলে ডানা মেলে এক ঝাপটায় আকাশে উড়াল দেয়। দরজাটা পার হয়েই রুপা সেভাবেই হৈ হৈ করে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে লাগলো। দরজার পাশেই যে ঝোপটা আছে সেটা পার হতেই একটা খোলা মাঠ। তারই এক পাশে চাষের ক্ষেত আর অন্য পাশে একটা বড় পুকুর। পুকুরের পাড়ে অতিকায় দানবের মতো দাড়িয়ে আছে একটা শিমুল গাছ। বষন্তে তার লাল ফুলগুলো কিছুটা পুকুরের পানিতে আর বাকিটা মাটির উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে। এ সময় এখানে আসলে বেশ সুন্দর সময় কেটে যায়। একা একাই ফুল নিয়ে খেলতে খেলতে কখন যে এক বেলা পার হয়ে যায় বুঝতেই পারে না রুপা। তার দেরি দেখে মনিরাই তখন এসে তাকে বাড়ি ফেরার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে আবার উল্টোটাও ঘটে। খেলার মাঝে মনিরা এসে বলে যায়,

— খালামনি কি একটা কাজে বাইরে গেছেন। বাড়িতে কেউ নেই।

অর্থাৎ সেদিন বিকালের পড়াটা ফাঁকি দিলেই সন্ধ্যা পর্যন্ত খেলা-ধুলা করা যায়। এমন সুযোগ রুপার খুব একটা হয় না। আবার সুযোগ হলেই যে সে তার সদ্ব্যবহার করে তাও নয়। একা একা কতক্ষণ আর খেলতে ভাল লাগে! আসলে এদিকটা খুব নির্জন। সাধারনত মনুষজন এদিকে আসে না। রুপার বয়সের কোনো ছেলে বা মেয়ে তো বলতে গেলে একেবারেই আসে না। আর কারো সাথে কখনও দেখা হয়ে গেলেও রুপা

তার সাথে ভাব জমাতে পারে না। ধনীর মেয়ে, শহরের স্কুলে পড়া, চেহারার সৌন্দর্য ইত্যাদি নানা রকম অহংকার ভেদ করে গ্রামের রোদে পোড়া, গরীব মানুষের ছেলে-মেয়েদের সাথে নির্বিঘ্নে মেলা-মেশা করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। অন্যরাও তাকে সম্ভ্রমের সাথে দেখে বরং বলতে গেলে ভয় করে। তাই তারাও কেউ তার সাথে বন্ধুত্ব করতে এগিয়ে আসে না। বাইরের জগতে এসেও তাই সে একাই থেকে গেছে। কয়েকজন ছেলে-মেয়ের সাথে বন্ধুত্ব করার চেষ্টা অবশ্য সে করেছে। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতেই সে তাদের এমনসব কথা-বার্তা শুনিয়েছে যে তারা পরে আর তার সাথে মিশতে সাহস পায়নি। খেলার ছলে কারো সাথে একটু বিবাদ হলেই বড় বড় সব হুমকী-ধামকী দিয়ে খেলার সাথীদের পিলে চমকে দিয়েছে সে। এভাবে নিজেই নিজেকে নিঃসঙ্গ করে ফেলেছে। রুপার বাবার পাহাড় সমান টাকা আছে অতএব ইচ্ছা করলে পুলিশ দিয়ে তার বাবা-মাকে জেল-হাজতে ভরতে পারে বা মাস্তান ভাড়া করে তাদের খড়ের চালে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে অথবা তার বড় দুই ভাইকে দিয়ে উল্টো করে গাছে ঝুলিয়ে তাকে বেধড়ক পিটুনী খাওয়াতে পারে ... । এতসব হুমকি ধামকি শুনলে কে-ই বা আর তার সাথে ভাব করতে আসবে! নিজের বাবা-মা বা বাড়ি-ঘরকে হুমকীর মুখে ফেলে দিয়ে তো আর খেলা-ধূলা চালিয়ে যাওয়া যায় না! এমন নিঃসঙ্গতার কারণে বাড়ির ভিতরের মতোই বাড়ির বাইরের জগতটাও তার কাছে হয়ে যাচ্ছিলো আরও একটা রুটিনের মতো। নতুন কোনো ঘটনা নেই, নতুন কারো সাথে বন্ধুত্ব নেই। ধীরে ধীরে তার মনে এমনকি বাইরের জগতের প্রতি একটা বিরক্তিও এসে গিয়েছিলো। কিছুটা আসক্তিও অবশ্য অবশিষ্ট ছিলো। সেই আসক্তির টানেই আজকের এই ছুটে আসা।

আজকের অভিজ্ঞতাটা অবশ্য আগের দিনগুলোর মতো একঘেয়ে হলো না। ঝোপটা পার হয়ে খোলা মাঠের কাছে পৌঁছাতেই রুপা অবাক হয়ে দেখলো প্রায় তারই বয়সের একটা ছেলে শিমুল গাছের নিচে দাড়িয়ে লম্বা একটা লাঠি দিয়ে খুচিয়ে খুচিয়ে তাজা তাজা ফুল পেড়ে নিচে ফেলছে আর দু চারটে ছাগল কাড়াকাড়ি করে রাক্ষসের মতো তা গিলে খাচ্ছে। ঘটনা দেখে তো রুপার চোখ চড়ক গাছে উঠে যায়। এত সুন্দর লাল লাল ফুলগুলো ছাগলে খেয়ে নষ্ট করে ফেলছে! ভাবতেই তার মনটা বিষিয়ে ওঠে। তার একমাত্র খেলার সাথী এই ফুলগুলো। চোখের সামনে তাদের এই হাল হতে দেখে কিছুতেই সে নিজেকে সামলাতে পারে না। বিকটভাবে চিৎকার করে সে বলে ওঠে,

— আরে এই এই, এটা কি হচ্ছে?

চিৎকার শুনে বাবুল প্রথমে কিছুটা ভড়কে যায়। মোড়লদের বাগান থেকে আম চুরি করার সময় এমন চিৎকার তাকে প্রায়ই শুনতে হয়। সেক্ষেত্রে নিয়ম হলো, চিৎকার যেদিক থেকে আসছে সেদিকে একবারও ভ্রূক্ষেপ না করে এবং চিৎকার কে করছে সে ব্যাপারে সামান্যও আগ্রহ না দেখিয়ে বিপরীত দিকে দৌঁড়ে পালানো। আজ অবশ্য সে তেমন কিছু করলো না। কারণ প্রথমে একটু ভড়কে গেলেও পরে তার মনে পড়ে গেছে যে, এটা মোড়লদের বাগান নয়। আর সে চুরি করে আমও পাড়ছে না। পরিত্যক্ত একটা শিমুলগাছের মূল্যহীন কটা ফুলই লাঠি দিয়ে পেড়ে পেড়ে গোটা কয়েক ছাগলকে খাওয়াচ্ছে। এর মধ্যে এমন বিকটভাবে চিৎকার করার কোনো কারণ আছে বলে তার মনে হলো না। তাছাড়া মোড়লদের বাগানে আম পাড়ার সময় যে ধরণের চিৎকার শোনা যায় আজকের চিৎকারটা তার চেয়ে আলাদা। চিৎকারটা যথাসম্ভব উঁচুস্বরে এবং সাধ্যমতো ভয়ংকরভাবেই করা হয়েছে বটে তবু যেনো এর মধ্যে ভয়ের চেয়ে আকর্ষণই বেশি। দৌঁড়ে পালিয়ে না গিয়ে তাই ব্যাপারটা কি তা লক্ষ্য করাই ভাল মনে হয় তার। চিৎকার যেদিক থেকে আসছে সেদিকে দৃষ্টি দিয়েই সে তো অবাক। ঢিলে ঢালা পোশাক পড়া একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় হাত দশেক দূরে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে চিৎকারটা সেই করেছে। কেবল করেছে নয় এখনও সমান তালে করে যাচ্ছে।

— এতগুলো টকটকে লাল ফুল অকারণে ছাগল দিয়ে খাইয়ে নষ্ট করছে, বেয়াদব ছেলে, চরম বদমাশ, হতচ্ছাড়া, শয়তান .....

ইত্যাদি নানা ভাষায় এক নাগাড়ে বকে চলেছে রুপা। আজ সে কেবল শোভন ভাষাগুলোই ব্যবহার করছে। মনিরাকে যেসব ভাষায় গালাগালি করে সেটা এখনও শুরু করেনি। আসলে কোনো মেয়ে কোনো ছেলেকে ঐসব ভাষায় গালাগালি করতে পারে না। তাছাড়া এই এলাকার ছেলে-মেয়েদের খুব বেশি গালাগাল করতেও হয় না। রুপাকে দেখলেই তারা এমনই ভয় পেয়ে যায় যে, দু'একটা কথা বলতে না বলতেই দৌঁড়ে পালায়। তেমনই একটা কিছু হবে এমন ভেবে রুপা তাই গালাগালির প্রথম অধ্যায়টাই কেবল আওড়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রবেশ করার প্রয়োজন বোধ করছে না।

বাবুল কিন্তু দৌঁড়ে পালালো না। পালিয়ে যে যাবে তেমন কোনো ভাবও দেখা গেলো না। বেশ কিছুক্ষণ এক নাগাড়ে রুপার দিকে তাকিয়ে থাকে সে। মুখ দিয়ে বিশ্রী সব

ভাষায় বাণ নিক্ষেপ অব্যাহত থাকলেও রুপার অসম্ভব সুন্দর দেহ, শিমুল ফুলের মতোই লাল দুটি ঠোঁট, টানা টানা দুটো মায়াবী চোখ, কাঁধ পর্যন্ত ঝুলে থাকা কালো মিচমিচে চুল আর মাজায় হাত রেখে নায়িকাদের মতো বাঁকা হয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গিটা বাবুলকে মুগ্ধ করে। বিদ্যুৎ চমকের মতোই চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়া এই সৌন্দর্যই যেনো বাবুলকে বেশ কিছুক্ষণ বেহুশ করে রাখে। মুখ দিয়ে তার যে অগ্নিবাণ নিক্ষেপ হচ্ছে তা যেনো তার গায়েই লাগে না, কানেও ঢোকে না।

ছেলেটা রুপাকে দেখে পালিয়ে যাওয়ার বদলে হা করে তারই দিকে তাকিয়ে আছে দেখে রাগের চোটে রুপা গালের মাত্রা আর গলার আওয়াজ দ্বিগুন বাড়িয়ে দিলো। তাতেই বাবুলের হুশ ফেরে। তখনই সে বুঝতে পারে মেয়েটা যতই সুন্দর হোক তার মুখের ভাষা আর কথা বলার ভঙ্গি মোটেও আদব-কায়দার মধ্যে পড়ে না। অকারণেই এমনভাবে চেঁচামেচি করছে যে মনে হচ্ছে ভর দুপুরে কারো বাড়ি ডাকাত পড়েছে। ভাগ্যিস! আশে-পাশে কেউ নেই। থাকলে এতক্ষণে ছুটে এসে বাবুলকে ঘিরে ধরতো। মেয়েটার সাথে তাকে জড়িয়ে কি না কি ভেবে হয়তো সবাই মিলে গনপিটুনিই দিয়ে দিতো তাকে। মনে মনে ভীষণ বিরক্ত হয় বাবুল।

— এত সুন্দর একটা মেয়ে আর এত খারাপ আচরণ! ছিঃ ছিঃ। যার বউ হবে সেই বেচারার দুঃখের কূল থাকবে না। দেখলেই কাছে যেতে ইচ্ছা করবে কিন্তু কাছে গেলেই ফোঁস করে কামড়ে দিতে আসবে। অনেকটা মৌমাছির চাকে হামলা করার মতো। মধু হয়তো শেষ-মেষ খাওয়া যাবে কিন্তু দু-চারটে কামড় খাওয়ার আগে নয়। আর বিয়ে না করে এর ধারে কাছে ঘেঁষা তো কল্পনারও অতীত।

এসব ভেবে কিছুটা হতাশা আর কিছুটা তাচ্ছিল্ল মিশ্রিত একটা দৃষ্টি রুপার দুটি চোখে নিক্ষেপ করে বাবুল আপন মনে নিজের কাজ করে যেতে লাগলো। তার হাব-ভাবে বেপরোয়া ভাবটা একেবারে স্পষ্ট। বাবুলের এমন বেপরোয়া ভাব দেখে রুপা তো তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো। বাম হাতটা মাজার উপরে রেখেই ডান হাতের আঙ্গুল নেড়ে নেড়ে বলতে লাগলো,

— তোর এত বড় সাহস! আমাকে চিনিস? আমি কার মেয়ে জানিস?

মেয়েটা কার বাবুল সেটা জানে না। এই মুহুর্তে সে জানতে চায়ও না। এখন মেয়েটার

উপরে মনে মনে তার এতো রাগ হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রীর মেয়ে হলেও তাকে সে একটুও ছেড়ে কথা বলবে না। মনে মনে সে পাঁকা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। গাল-মন্দ যা হবার হয়েছে। তার বাপ-দাদা, চৌদ্দ গোষ্ঠীর কেউ গালাগাল থেকে রেহাই পায়নি। যথেষ্ট সহ্য করেছে সে। এবার প্রতিটা কথার জবাব তাকে দিতেই হবে। তা না হলে সে তনু মল্লিকের নাতিই নয়।

কঠিন কঠিন সব পরিস্থিতিতে সাহসী ভূমিকা রাখার অভিজ্ঞতা বাবুলের আছে। তার সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, রেগে গেলে তার মাথায় ঠিক থাকে না। তখন কাকে যে কি বলে ফেলে সে নিজেই তা বলতে পারে না। প্রাইমারী স্কুলের মদন স্যার একবার পড়া না পারার কারণে তার কান মলে দিয়েছিলো আর ক্লাস ভর্তি ছাত্র-ছাত্রীরা হো হো করে হেসেছিলো। এতে বাবুলের মগজ গরম হয়ে যায়। ছুটির পরে বাড়ি ফেরার সময় দেখে মদন স্যার একটা ভাঙড়ি সাইকেল কোনো ক্রমে টেনে নিয়ে বাড়ি ফিরছেন। আর রোদে তার চুলবিহীন মাথাটা চকচক করছে। হঠাতই সে ছড়া কেটে বলে উঠলো,

— মদন টাক, মাথা ফাক, চুলগুলো সব চুলোয় যাক।

রাস্তায় আরো কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী হেটে বাড়ি ফিরছিলো। বাবুলের ছড়া শুনে তারা সবাই হো হো করে হেসে উঠলো। মদন স্যারও হাসির প্রথম থাক্কাটা সামলাতে পারলেন না। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে ভাঙড়ি সাইকেলটা রাস্তার উপরই এক রকম ছুড়ে ফেলে দিয়ে বাঘের মতো হুংকার ছেড়ে ছুটে গেলেন বাবুলের দিকে। বাবুল ততক্ষণে রাস্তা ছেড়ে পাশের ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেছে। ঝোপ ঝাড় আর চাষ ক্ষেত পার হয়ে বাড়ি যাওয়ার ডজন খানেক রাস্তা তার জানা আছে। নিরুপায় হয়ে মদন স্যার শেষে আশে-পাশের যেসব ছাত্র-ছাত্রীরা বাবুলের ছাড়াটা শুনে হেসেছিলো বা তখনও হাসছিলো তাদেরই কাউকে চড় থাপ্পড় দিয়ে আর কাউকে গালাগালি করে মনের জ্বালা মিটিয়ে নিলেন।

সেই থেকে আর স্কুলে যাওয়া হয়নি বাবুলের। সে হিসেবে তাকে অশিক্ষিতই বলা চলে তবে নিরক্ষর অবশ্যই নয়। যেটুকু সময় ক্লাস করেছে তাতেই বাংলা পড়াটা মোটামুটি শিখে নিয়েছিলো। তারই বদৌলতে গল্প-টল্প পড়তে পারে। গল্প পড়ার ঝোঁকও তার আছে ভালই। মাঝে মাঝে এমন গল্পও পড়ে যা বড়দেরই পড়া উচিৎ। তারই বদৌলতে রুপাকে দেখার সাথে সাথেই তাকে নিয়ে সাত-পাঁচ নানা কথা ভাবা হয়ে গেছে তার।

মেয়েটার অপরূপ রূপ তার সে ভাবনার পালে হাওয়া হিসেবে কাজ করেছে। কিন্তু তার মুখের ভাষা সব আশাকে হাতাশায় পরিণত করেছে। রাগে এখন তার মনটা তাই সেদিনের মতই জ্বলে উঠেছে। এখন যে সে কি বলে ফেলবে আর তার কারণে তার যে কি ক্ষতি হয়ে যাবে সেটা নিশ্চিত করে সেও বলতে পারে না। জোর করে নিজের মাথাটা তাই ঠান্ডা করার চেষ্টা করে বাবুল। কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা। মেয়েটা তার দিকে এমনভাবে আঙ্গুল উচু করে কথা বলছে যে মনে হচ্ছে সে দেশের রাণী আর বাবুল তার চাকর। এখনই একটা উত্তর না দিলে এই অবস্থান পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।

গ্রামের ছেলে হিসেবে গালাগালি যে বাবুলেরও জানা নেই তা নয়। কিন্তু এই সুন্দর মেয়েটার উপর প্রথমবারেই সেগুলো প্রয়োগ করতে ইচ্ছা হচ্ছে না। সেগুলো পরেও বলা যাবে। কত পরে বাবুল সেটা জানে না। হয়তো এতটা পরে যখন সেগুলো শুনতে তার ভালই লাগবে। আপাতত তাই গালাগালির প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদের কিছু শব্দ থেকে মনের মতো একটা শব্দ বাছাই করে নিতে হবে। কি বলা যায় বাবুল তা নিয়ে ভাবার চেষ্টা করে কিন্তু মেয়েটা যেভাবে মুখ চালিয়ে যাচ্ছে তাতে ব্রেন ঠান্ডা করে ভাবনা-চিন্তার সুযোগই পাওয়া যাচ্ছে না। উল্টো মগজটা কেবলই গরম হয়ে যাচ্ছে। খুব কষ্ট করে কিছুক্ষণ ভেবে রাগত স্বরে বাবুল বলে,

— তুমি খুব বদ।

রুপা যেসব ভাষা ব্যবহার করেছে তার তুলনায় বাবুলের কথাটা একেবারেই জলভাত। কিন্তু তাতেই কাজ হলো। রুপা কিছুক্ষণের জন্য চুপ হয়ে গেলো। আসলে এই প্রথম তার কথার জবাবে কেউ কথা বলেছে। কথাটা যতই হালকা হোক সেটা হজম করতে তাই তার কিছু সময় লাগলো। সময় যে খুব বেশি লাগলো তা নয়। সামান্য সময় পরেই সে আগের চেয়ে তিনগুণ রাগ প্রকাশ করে বলল,

— এত বড় সাহস। আমাকে বলে বদ। দাঁড়াও ভাইয়াকে বলে আমি তোমাকে গাছে ঝুলিয়ে পিটুনি খাওয়াবো।

কথাটা শুনে বাবুলের মনটা বেশ খানিকটা ত্রস্ত হলো। মেয়ে মানুষের এই এক সমস্যা। প্রথমে নিজেই হৈ চৈ শুরু করবে পরে কথায় না পারলে একে-তাকে ডাকা-ডাকি করে হাঙ্গামা বাধিয়ে দেবে। যাকে বলে মেরেও জিতবো, কেঁদেও জিতবো। এতটুকু বয়সেই

বাবুলের অভিজ্ঞাতা হয়েছে ঢের। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় বাড়ির মানুষ আর বড় ভাইয়ের আসকারাতেই মেয়েরা এমন বেয়াদব হয়। এসব মেয়েরা যার-তার সাথে ঝগড়া বাধায় আর বাড়ির লোক এসে নিজের মেয়েকে শাসন না করে দ্বিতীয় পক্ষের উপর চড়াও হয়। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় পক্ষ ছেলে হলে তো কথায় নেই। প্রমাণ ছাড়াই কি না কি ভেবে সরাসরি গরু পিটুনি দিয়ে দিলেও সমাজে তার কোনো বিচার হয় না। এই মেয়েটারও এমন কোনো বড় ভাই থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তা না হলে কি আর কোনো মেয়ে এমন কেউটে হয়! মনে মনে বাবুল তাই বেশ ভয় পেলো তবে সেই ভয় কথা বা কাজে প্রকাশ করলে পরাজয় হবে ভেবে জোর করে সাহস সঞ্চার করে বলল,

— আরে যাও যাও ভাইকে ডাকো। বাবুল মিঞা কাউকে ভয় পায় না।

এতক্ষণে রুপা ছেলেটার নাম জানতে পারলো। ছেলেটার সাহস দেখে কিছুটা অবাকও হলো। একটি নয়, রুপার দু'দুটি বড় ভাই আছে। তাদের শরীরও বিরাটাকায় সব দানবের মতো। তাদের চেনে না বলেই হয়তো ছেলেটা এতটা সাহস দেখাচ্ছে। কিন্তু ভাইদের বললে তারা তার কি অবস্থা করতে পারে বেচারা সেটা জানেই না। তাতে অবশ্য ক্ষতিও আছে। ভাইরা এসব জানতে পারলে তার বাইরে আসার সুযোগই শেষ হয়ে যাবে। তারা আবার বাবা-মায়ের চেয়েও বেশি কড়া। কিন্তু সে কথা তো আর এই বদমাশকে বলা যাবে না। রুপা তাই প্রসঙ্গ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে ছেলেটার নাম নিয়ে একটা ব্যাঙ্গাত্মক ছড়া তৈরী করার চেষ্টা করে। এর তার নাম ভাঙিয়ে মজার মজার ছড়া তৈরী করার ব্যাপারটা রুপার কাছে অনেকটা নেশার মতো। এ ব্যাপারে সে আবার পাকা ওস্তাদ। স্কুলের সব বন্ধু-বান্ধব আর কাজের মেয়ে মনিরা তো বটেই এমনকি তার বড় দুই ভাই এবং বাবা-মার নামেও রয়েছে দু'য়েক লাইনের ব্যাঙ্গাত্মক সব ছড়া। একটু ভেবেই বাবুলের নামে সে একটা ছড়া তৈরী করে ফেলল। তারপর প্রথমে মুখ ভেংচে বলল,

— আহা কি নাম! বাবুল মিঞা।

পরে ছড়া কেটে বলল,

— বাবার ছেলে বাবুল মিঞা, বাবলা গাছে ওঠো গিয়া

প্রতিপক্ষ ভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ করছে দেখে বাবুল কিছুটা হকচকিয়ে গেলো। এতে

অবশ্য রাগার মতো কোনো কারণ সে খুঁজে পেলো না। এতক্ষণ মেয়েটা যেসব ভাষা ব্যবহার করেছে তার তুলনায় তার ছড়াটা বলা চলে অনেকটা “আই লাভ ইউ” বলার মতো। বাবার ছেলে তো আর খারাপ জিনিস নয়। সব ছেলেই তো বাবার ছেলে। যে বাবার ছেলে নয় সেটাই বরং খারাপ কথা। আর বাবলা গাছে চড়ার বিষয়টা কাঁটার কারণে এমনিতে কষ্টকর হলেও বাবুলের কাছে তা একেবারেই জলভাত। অতএব তাতেও কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে ছড়াটা তাকে ব্যাঙ্গ করেই বলা হয়েছে। এটাই বড় কথা। অতএব, এর একটা উত্তর দেওয়াই চায়। ছড়া কাটার অভ্যাস তারও আছে। কিন্তু তার জন্য তো মেয়েটার নাম জানতে হবে আগে। সরাসরি জিজ্ঞাসা করলে হয়তো উত্তর দেবে না তাই বাবুল একটু কায়দা করে বলে,

— হু, হু। আর তোমার নাম নিশ্চয় হুতুম পেঁচা। হুতুম পেঁচা, হুতুম পেঁচা, হুম হুম হুম।

কথাটা বলে বাবুল দুই হাত উঁচু করে আর মুখ ভেংচে এমনভাবে লাফিয়ে উঠলো যে রুপা তার রুপালী দাঁতগুলো বের হয়ে হি হি করে না হেসে পারলো ন।

সেদিকে তাকিয়ে বাবুল আরও একবার চমকে উঠলো। হাসলে মেয়েটাকে হাজারগুণ সুন্দর দেখায়। দাঁত তো নয় যেনো মুক্তার দানা। ঐ দাঁতগুলোর ফাঁক দিয়েই যে এতগুলো গালাগাল বের হয়েছে তা বিশ্বাসই হতে চায় না। হাস্যজ্বল মুখটা তার যেনো ঠিক পূর্ণিমার চাঁদ। সেদিকে তাকিয়ে থেকে বাবুল যেনো ভুলেই যায় এই মেয়েটার সাথেই সে ঝগড়া করছে। দেহ মন যেনো তার অসাড় হয়ে যায়। প্রতিপক্ষের এই দূর্বলতার সুযোগ নিয়েই হাসি থামিয়ে রুপা বলে,

— বা রে, আমার নাম হুতুম পেঁচা হবে কেনো? আমার নাম রুপা। কেমন সুন্দর নাম! তুমিই তো হুতুম পেঁচা। যেভাবে পেঁচার মতো অভিনয় করছো।

বাবুল ভাবে,

— তাইতো, কেমন সুন্দর নাম! রুপার মতোই চকচকে দেহখানা তার। আর রুপার মতোই ঝলমলে সাদা দাঁত। এমন মেয়ের নাম রুপা ছাড়া আর কি হবে! নাম যেনো তার গায়েই লেখা রয়েছে। নাম যেনো সে মায়ের পেট থেকেই নিয়ে এসেছে।

এমন একটা সুন্দর নামের উপর ব্যাঙ্গ করে ছড়া কাটা খুব সহজ ব্যপার নয়। বাবুল তাই বেশ মুশকিলে পড়ে যায়। তবে যুদ্ধের ময়দানে প্রতিপক্ষের সাথে কোনো আপস

চলে না। জবাব তাকে দিতেই হবে। আর জবাবটা অবশ্যই হতে হবে মারাত্মকভাবে অপমানজনক। একটু ভেবে সে একটা উপায় পেয়ে যায়। টেনে টেনে বলে,

— যার নাম রুপা, সে একটা ধোপা।

ছড়াটা বলার পর হো হো করে হেসে নিজের জামা আর প্যান্ট হাত দ্বারা টেনে টেনে দেখিয়ে বলে,

— এসো এসো, জামা-প্যান্ট খুলে দিচ্ছি, পুকুর থেকে ধুয়ে এনে দাও।

বাবুলের মনে হয় ছড়াটা বেশ চমৎকার হয়েছে। তার হাসি যেনো আর থামে না। ওদিকে ছড়াটা শুনে অপমানে রুপার মুখটা একেবারে লাল হয়ে যায়। সে হলো, এই এলাকার শ্রেষ্ঠ ধনীর একমাত্র মেয়ে। বলতে গেলে রাজকন্যার মতো। অজ পাড়া গাঁয়ের অশিক্ষিত একটা রাখাল ছেলে কিনা তাকে বলছে তার জামা-প্যান্ট ধুয়ে দিতে! লজ্জায় অপমানে তার ইচ্ছা হয় পুকুরে ডুবে মরতে। কিন্তু সে হবে পরাজয়। আর পরাজয় মেনে নেওয়া রুপার কাজ নয়। প্রয়োজনে সে আমরণ ঝগড়া চালিয়ে যাবে। আবারও সে ভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ করার চেষ্টা করলো। কিছুটা ব্যাথিত কিন্তু সমভাবে রাগত স্বরে বলে উঠলো,

— আমার বাবাকে চেনো? তোমাকে ধরে পুলিশে দেবে।

এই হুমকিতে বাবুল একটুও ভয় পেলো না। সে জানে পুলিশ অত কষ্ট করে তার মত ছোট একটা ছেলেকে ধরতে এই অজ পাড়াগাঁয়ে আসবে না। পুলিশ এখানে আসে না বলেই বড় বড় সব চোর-ডাকাত এসে এখানে লুকিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে অবশ্য পুলিশের লোক এসে তাদের কাছে মাসোহারা নিয়ে যায়। এ তুলনায় সে আর এমন কি করেছে? কটা শিমুল গাছের ফুল পেড়েছে, আর এই মেয়েটার সাথে একটু কথা কাটাকাটি করেছে। আর তো কিছু করেনি। তবে পুলিশ তাকে কেনো ধরতে আসবে। বিকটভাবে হেসে তাই সে বলে,

— হা, হা। পুলিশ। পুলিশ আমার কচু করবে। শোনোনি মানুষ বলে, মাছের রাজা ইলিশ আর ঘুষের রাজা পুলিশ।

একথা শুনে রুপা আরো রেগে যায়। ছেলেটা পুলিশকেও ভয় পায় না দেখে সে মনে

মনে আতংকিত হয়ে পড়ে। কোনো কিছুকেই যদি ভয় না করে তবে একে টাইট দেওয়া যায় কিভাবে? একবার ভাবে মনিরাকে ডেকে এনে দুজনে মিলে এর সাথে ঝগড়া করবে। কিন্তু সেটাও এক রকম পরাজয় ভেবে তা থেকে বিরত থাকে। এদিকে বেলাও গড়িয়ে গেছে অনেকটা। এখনই বাড়ি ফিরে না গেলে রুপা নিজেই টাইট হয়ে যাবে। অতএব ঝগড়া-ঝাটিতে আজকের মতো বিরতি দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। কিন্তু এখন ঝগড়াটা যে অবস্থায় রয়েছে তাতে এখনি বিরতি দিলে পরাজয়ের পাল্লাটা তার দিকেই ঝুঁকে যাবে। ঝগড়ায় ভারসাম্য আনার জন্য তাই সে বলে,

— এত বড় সাহস! দাঁড়াও এখানে। আমি আমার ভাইয়াকে ডেকে আনছি।

কথাটা বলে, এক দৌঁড়ে রুপা বাড়ির দিকে চলে যায়। বাবুল এবার সত্যি সত্যিই ভয় পেয়ে যায়। তবে সাহস হারায় না পুরাপুরি। ছাগলগুলো একদিকে খেদিয়ে দিয়ে নিজে একটা ঝোপের আড়ালে বসে উঁকি মেরে দেখতে থাকে আদৌ কেউ আসে কি না। এভাবে অনেক্ষণ বসে থাকার পরও কেউ আসছে না দেখে সে পুকুরের দিকে নেমে যায়। তার সব কাজ এখনও শেষ হয়নি। ছাগলগুলোর পেট হয়তো ভরেছে কিন্তু তাকে এখনও স্নান সারতে হবে। মাঝে মাঝে এদিকে আসলে নির্জন এলাকার সুন্দর পুকুরটিতে স্নান করার লোভ সামলাতে পারে না সে। ছাগলগুলোকে খোলা মাঠে ঘাস খেতে ছেড়ে দিয়ে নিজে পুকুরে নেমে পড়ে। তার স্নানের নিয়ম গ্রামের আর দু'চারটে ডানপিটে কিশোর ছেলের মতোই। চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে কেউ আছে কিনা দেখে নিয়ে জামা-প্যান্ট ডাঙায় খুলে রেখে দ্রুত লাফ দিয়ে পানিতে গিয়ে পড়া। তারপর আর চিন্তা নেই। ইচ্ছামত পানির মধ্যে লাফা-ঝাপা করার পর একই পন্থায় আবারও দ্রুত উঠে এসে জামা-কাপড় পরে নিয়ে ছাগলগুলোর কাছে ফিরে আসা। তারপর যখন মনে হয় ছাগলগুলোর পেট ভরে গেছে তখন তাদের নিয়ে বাড়ি ফেরা। স্নানের পর রোদে শুকিয়ে আতেলা শরীরটা তখন তার ভীষণ খসখসে থাকে। বাড়ি ফেরার সাথে সাথেই মা ধরে পাঁকড়ে তার গা-মাথায় তেল মালিশ করে এক থালা ভাত সামনে রেখে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। একই পন্থায় পুকুরে নেমে ঝপাঝপ দুটো ডুব দিয়েই আজ স্নান সারে বাবুল। আজ আর বেশি সময় নেই। বিচ্ছু মেয়েটার সাথে ঝগড়া করতে করতে অনেকটা সময় পার হয়ে গেছে। স্নান শেষে বিজয়ীর ভঙ্গিতে বুক ফুলিয়ে বাড়ির দিকে চলে যায় সে।

৩.

বাড়ি ফিরেই যথাবিহিত তেল মালিশের পর পেট পুরে অন্ন গ্রহণ করেই বাবুল চলে যায় পাড়ার ছেলেদের সাথে খেলা-ধূলা করতে। সে খুব ভাল মার্বেল খেলে। দু'টাকায় বারোটা মার্বেল কিনে খেলা শুরু করে এখন সে প্রায় শ'খানেক মার্বেলের মালিক। পাড়ার ছেলেদের অনেকেই হারের ভয়ে তার সাথে আর খেলতে চায় না। সে অবশ্য তাদের পটিয়ে পাটিয়ে ঠিক রাজি করিয়ে নেয়। অনেক সময় দু'দশটা মার্বেল ধারও দেয়। তারপর খেলায় তাকে হারিয়ে ধার দেওয়া মার্বেলের সাথে সাথে তার নিজের মার্বেলগুলোও জিতে নেয়। আজ ঘটনা ঘটলো বিপরীত। নানা কৌশলে নানা জনের সাথে মার্বেল সে খেললো বটে কিন্তু জিততে পারলো না কারো সাথে। সন্ধ্যা পর্যন্ত খেলে যখন পচিশ-ত্রিশটা মার্বেল হেরে গেলো তখনই বাবুল বুঝতে পারলো মার্বেল খেলার মতো মানসিকতা আজ আর তার নেই। আসলে বাইরে মার্বেল খেললেও তার ভিতরে চলছিলো অন্য খেলা। বাড়ি ফিরে যখন গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে গরু-ছাগলের খাবার দিচ্ছিলো তখনও বাবুলের মনটা দুপুরের স্মৃতিকে মন্থন করে চলেছে। পরে সব কাজ শেষে বাবুল যখন হারিকেন জ্বালিয়ে নতুন কেনা গল্পের বইটা পড়ার জন্য টেবিলে বসলো তখনও বইয়ের গল্পে কিছুতেই মনটাকে ঢোকাতে পারলো না। সচারাচর এমন হয় না তার। স্কুলে যখন পড়তো তখন ক্লাসের পড়ায় একদমই মন বসতো না। কিন্তু গল্পের বই-টই পড়তে তার বেশ ভাল লাগে। পরিচিত সব বন্ধু-বান্ধব বা চাচাতো-ফুফাতো ভাই বোনদের সংগ্রহে যত বই আছে তার কিছু ধার নিয়ে আর বাকিটা চুরি করে তার পড়া হয়ে গেছে। বড় ভাই-বোনদের অগোচরে তাদের সংগ্রহে থাকা বড়দের কিছু বইও সে পড়েছে। তারই বদৌলতে মেয়েলী ব্যাপারে সে একটু সকাল-সকালই ইঁচড়ে পাঁকা হয়ে গেছে। এতগুলো বই যে পড়েছে বই পড়া যে তার চরম নেশা তা বলাই বাহুল্য। বিশেষত নতুন কোনো গল্পের বই এমন কারো হাতে পড়লে তাতে মনোযোগ বসাতে কোনো সমস্যা যে হওয়ার কথা নয় তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

তবু আজ বাবুলের গল্পের বইতে একটুও মন বসে না। আজ কেবলই তার নিজের গল্পটা নিয়ে ভাবতে ইচ্ছা করে। বইটা এক দিকে ঠেলে ফেলে দু-চোখ বুজে বাবুল সেটাই ভাবতে লাগলো। আর তখনই সুযোগ পেয়ে দুপুরের ঘটনাটা ভোরের স্বপ্নের

মতোই পরিষ্কারভাবে বাবুলের মনের পর্দায় ভেসে উঠলো। রুপাকে ঘিরে যত দৃশ্য সবই যেনো আবারও বাবুল চোখের সামনে দেখতে পেলো। রুপার মতোই ঝলমলে চেহারা, মুক্তাঝরা দুধ সাদা দাঁত, মাজায় হাত দিয়ে বাঁকা হয়ে দাড়াবার ভঙ্গি, কাঁধ পর্যন্ত ঝুলে থাকা কালো চুলগুলো ডানে বায়ে দুলিয়ে মাথা নাড়িয়ে কথা বলার স্টাইল ইত্যাদি সকল কিছুই বাবুলের মন-মগজকে আলোড়িত করতে লাগলো। মেয়েটার প্রতি মায়াবী এক টান যেনো তাকে আবিষ্ট করে ফেললো। বই পড়ে যতটুকু সে বুঝেছে তাতে মনে হয়, এমন অনুভূতিকেই আসলে প্রেম বলে।

— কিন্তু প্রথম দেখায় কারো সাথে কিভাবে প্রেম হতে পারে! গল্পে এমন ঘটনা অবশ্য প্রায়ই ঘটে কিন্তু বাস্তবে কি তা সম্ভব?

এটা সম্ভব কি অসম্ভব এমন জটিল প্রশ্নের উত্তর নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো মানসিকতা বাবুলের নেই। তার মনে ভিন্ন একটা কিছু করার ইচ্ছা জাগে। এমন একটা কাজ যাকে একবাক্যে বলা যায় অসাধারন। যা তার অন্তরের প্রেমকে বাইরে প্রকাশ করতে পারে। এমন একটা পরিকল্পণাও এখন তার মাথায় ঘুরঘুর করছে। ছোট ভাইয়ের রঙ পেন্সিল আর ছবি আঁকার খাতাটা নিয়ে একমনে সে ছবি আঁকতে থাকে। তার ছোট ভাই হাবুল কেজিতে পড়ে। ছবি আঁকা তার ক্লাসের বিষয়। তার জন্যই দামী রঙ পেন্সিল, আঁকার খাতা ইত্যাদি সব ছবি আঁকার সরঞ্জাম কিনে দিয়েছেন ছোট মামা। সেগুলো হাবুলের চেয়ে বাবুলই বেশি ব্যবহার করে। ছবি আঁকার হাতও তার চমৎকার। ছোট থেকেই স্কুলের ছেলে-মেয়েদের কাছে ছবি আঁকায় ভীষণ নাম ছিলো তার। বাড়ির অন্যান্য কাজ-কর্মের পাশাপাশি মার্বেল খেলা, ছবি আঁকা আর বই পড়া নিয়েই বাবুলের জীবন।

যাচ্ছেতাই ভাবে সাদা পৃষ্ঠার এদিক সেদিক নানা রঙের পেন্সিল দিয়ে খোঁচাখুচি করতে থাকে বাবুল। মাঝে মাঝে চোখ বুজে মনের পর্দায় কোনো একটা চিত্র ভাসিয়ে তুলছে তারপর একের পর এক পেন্সিল বদল করে খাতায় একেবেকে বুলিয়ে যাচ্ছে। এভাবে পেন্সিলের ঘসাঘসি চলতে থাকার বদৌলতে কিছুক্ষণের মধ্যেই বাবুলের সামনের সাদা পৃষ্ঠায় ফুটে উঠলো একটা অতীব সুন্দরী কিশোরীর মুখাবয়ব। বাবুল খাতাটা উঁচু করে চোখের নিকটে রেখে এদিক সেদিক ঘুরিয়ে পরখ করে দেখলো চেহারাটা রুপার মতো হয়েছে কিনা তারপর যখন মনে হলো, ছবির চেহারাটা হুবহু রুপার মতো না হলেও তার কাছাকাছিই হয়েছে তখন ভীষণ খুশি হয়ে সে বাকী ছবিটার দিকে মন দিলো।

চেহারার ক্ষেত্রে বাস্তবে যা দেখেছে সেভাবে আঁকার চেষ্টা করলেও বাকী শরীরটার ক্ষেত্রে বাবুল কিন্তু ভিন্ন নীতি অবলম্বন করলো। বাকী শরীরটা যেভাবে দেখেছে সেভাবে নয় বরং বাবুল যেভাবে দেখতে চায় সেভাবে আঁকার চেষ্টা করলো। রুপার পরনে ঢিলে ঢালা পোশাক ছিলো। কিন্তু বাবুল নিজের কল্পনাশক্তিকে সর্বোচ্চ প্রয়োগ করে সম্পূর্ণ টাইট পোশাকে হালকা গড়নের কোনো সুন্দরী কিশোরীর দেহ যেমন লাগতে পারে রুপার দেহটাকে সেভাবে আঁকার চেষ্টা করলো। ছবিটা শেষ হতেই দেখা গেলো, পরীর মতো সুন্দরী একটা কিশোরী মাজায় হাত দিয়ে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে বাঁকা হয়ে দাড়িয়ে আছে। গায়ের পোশাক যেনো শরীরের চামড়ার সাথেই লেগে আছে। আর শরীরের প্রতিটা ভাজ যেনো তাতে স্পষ্ট ফুটে উঠছে। নিচের পাজামাটা তার সরু পা বেয়ে কোনো মতে হাটুর নিচ পর্যন্ত পৌঁছেছে। পোশাক যেনো তার শরীরকে ঢাকার পরিবর্তে আরো বেশি আকর্ষণীয়ভাবে প্রকাশ করে দিচ্ছে।

এক কথায় বলা যায় পলিথিনের পাতলা চাল যেমন প্রবল বর্ষণকে বাধা দিতে ব্যর্থ হয় পরীর মতো সুন্দরী এই কিশোরীর পাতলা পোশাক তেমনই তার সৌন্দর্যকে ঢেকে রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। অথবা প্রবল পানির স্রোত যেমন দূর্বল একটা বাধের স্থানে স্থানে ফুটো করে ফিনকী দিয়ে বের হয়ে আসে। ছবির এই মেয়েটির আকর্ষণীয় স্থানগুলো তার পাতলা পোশাককে ছিন্ন-ভিন্ন করে ছিঁটকে বাইরে বের হয়ে আসছে।

ছবিটা আঁকা শেষ করে বাবুল মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেদিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। নিজের অজান্তেই সে বলে ওঠে,

— সত্যিই অসাধারন!

এতটা ভাল ছবি যে কখনও আঁকতে পারবে তা সে কল্পনাও করেনি কোনোদিন। রুপার প্রতি মায়াবী এক আবেগই তাকে এমন একটা অসাধ্য সাধন করতে সাহায্য করেছে। ভিঞ্চিও হয়তো কোনো মেয়ের প্রেমে পড়ে মোনালিসার ছবি এঁকেছিলো। আর এ যুগে এসে বাবুল নিজেই একে ফেললো আরেক মোনালিসার ছবি। যার নাম রুপা। মেয়েরা সত্যিই রহস্যময়ী এক সৃষ্টি আর তাদের সাথে প্রেম তদাপেক্ষা রহস্যময় এক জিনিস। কোনো এক মনীষী বলেছেন, “পুরুষ সকল শক্তির খনি আর নারী হলো তার সম্মোহনী।”

নিজের কর্মের প্রসংশা করেই বেশ কিছু সময় কেটে গেলো বাবুলের। তারপর আবারো সে মনযোগী হলো ছবির মেয়েটার সৌন্দর্যের প্রতি। মেয়েটার প্রতি মমতায় তার মনটা ভরে উঠলো। একবার বুকে আর একবার মুখে ঠেঁকিয়ে সেই মমতাকেই সে বারংবার প্রকাশ করতে লাগলো। মন জুড়ে তখন তার একটিই ভাবনা,

— তার প্রেম কি এই ছবিতেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে নাকি সত্যিকার রুপাকে কোনোদিন জয় করতে পারবে।

রুপাকে নিয়ে যতবারই ভাবে তার মনে হয় এমন মেয়েকে প্রেমের ফাঁদে ফেলা অসম্ভব। একে তো ধনীর মেয়ে তাতে আবার পরীর মতো সুন্দরী। সেই সাথে বন্য হাতীর মতো রাগী, ঘোড়ার মতো তেজী আর ময়ূরের মতো অহংকারী। এমন মেয়েকে বাগে আনা লাইলীর প্রেমিক মজনুর পক্ষেও অসম্ভব ছিলো বলেই বাবুলের মনে হয়। তবু মনে মনে সে রুপাকে চায়। তাকে আশা করে। সে ভাবে,

— কে জানে, জাতের ঘোড়া যেমন দক্ষ ঘোড়সওয়ারের হাতে ধরা দেয়। তার জাত-কূল বা অর্থ সম্পদের দিকে লক্ষ্য করে না। ভালভাবে বশ মানাতে পারলে রুপাও হয়তো একদিন তার গর্ব, অহংকার সব ভুলে তার মতো রাখালকেই তার দেহ-মনের মালিক হিসেবে স্বীকার করে নেবে।

কোনো এক বইতে বাবুল পড়েছে,

— বাইরে কোনো নারী যত বেশিই তেজী আর অহংকারী হোক তার ভিতরে কোমল আর দূর্বল স্থান একটা অবশ্যই আছে। শক্ত মাটি বা পাথর কেটে যেভাবে দামী দামী সব খনিজদ্রব্য বের করে আনা হয়। নারী মনের বাইরের এই শক্ত পর্দাটি ভেদ করার পরই তার অন্তরের কোমল অংশটি আবিষ্কার করা যায়।

বাবুল ভাবে,

— এই জটিলতার কারণেই প্রেম রহস্যময়। একারণেই প্রেমে এতো মজা। তা না হলে বিষয়টা দুনিয়ার আর দু’চারটে সাধারন কাজের মতোই রসকষহীন বিস্বাদ বিষয় বলেই গণ্য হতে। তাতে যে, এই দুনিয়ার নিরানব্বই ভাগ মজাই ফুরিয়ে যেতো তা নিঃসন্দেহে বলা যায়!

এতক্ষণে বাবুলের মনে হয়,

— তেজী আর অহংকারী হওয়ার কারণেই রুপা তার মনটা এতটা দ্রুত আকর্ষণ করতে পেরেছে। আর এই তেজী ঘোড়াকে বশ মানাতে পারলেই সে হবে দিগ্বিজয়ী বীর।

মুষ্টিবদ্ধ হাতে টেবিলে একটা কিল মেরে মনে মনে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বাবুল। তারপর খাতা থেকে ছবির পৃষ্ঠাটা ছিড়ে ভাজ করে বালিশের নিচে রেখে সে ঘুমাতে যায়। রাত তখন অনেক হয়েছে। বিছানায় এলিয়ে পড়ার সাথে সাথেই তাই গভীর ঘুমে তলিয়ে যায় সে। ঘুমের মধ্যে রুপাকে নিয়ে কত যে স্বপ্ন দেখে তার গনতি নেই।

ওদিকে এক দৌঁড়ে বাড়ি ফিরেই রুপা বই-পত্তর নিয়ে প্রাইভেট পড়তে চলে গেলো। যাওয়া-আসার সময় বান্ধবীদের সাথে হৈ হুল্লোড় আর বাড়ি ফিরে টিভি শো নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে বিকালের ঘটনা তার সেভাবে মনেই পড়লো না। রাতে নিজের বেড রুমে গিয়ে হালকা হলুদ আলো জ্বালিয়ে অভ্যাসমতো চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। বেশিরভাগ দিনই শোবার সাথে সাথেই ঘুম এসে যায় রুপার এবং নিমিষেই রাত কেটে যায়। আজও তেমনই হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু তা হলো না। চিৎ হয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ চোখ বুজে পড়ে থেকে যখন ঘুম আসলো না তখন ডানে-বায়ে পাশ ফিরে ঘুমানোর চেষ্টা করলো। তাতেও যখন কাজ হলো না তখন একশ, নিরানব্বই, আটানব্বই এভাবে উল্টো গুনতে শুরু করলো। এতেও কাজ না হলে হঠাৎ বিরক্ত হয়ে বিছানা ছেড়েই উঠে পড়লো রুপা। বড় লাইটটা জ্বালিয়ে পড়ার টেবিলে গিয়ে বসে থাকলো কিছুক্ষণ। ঘুম না আসার কারণ কি সেটা নিয়ে ভাবলো। বিকেলের ঘটনাটা তার মনে আছে বটে কিন্তু সে কারণেই যে ঘুম আসছে না তা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। ঐ রাখাল ছেলেটার সাথে এমন কিছুই হয়নি যাতে তার রাতের ঘুম হারাম হয়ে যাবে। নিজের বয়সের ছেলে-মেয়েদের সাথে ওমন ঝগড়া-বিবাদ সে প্রায়ই করে। তাতে বিশেষ কোনো ব্যাপার নেই। আজকের ঘটনায় একটা পার্থক্য অবশ্য আছে। রুপা মনে মনে ভাবে,

— নচ্ছার ছেলেটার সাহস খুব।

রুপার সাথে ওভাবে তর্ক করার দুঃসাহস করে না কেউ। আবোল তাবোল গালমন্দ আর সান্ডা-গোন্ডা দুই ভাইয়ের ভয়ে তার বয়সী ছেলে-মেয়েরা সবাই তাকে ভীষণ ভয়

করে চলে। এই ছেলেটাই একটু ব্যতিক্রম। রুপাকে সে কিনা ধোপা বলে ডাকে! আর নিজের প্যান্ট-জামা ধুয়ে দিতে বলে! রাখাল ছেলে হয়ে রাজকুমারীকে নিজের চাকর বানানোর চক্রান্ত। ঘেন্নায় রুপার মনটা বিষিয়ে ওঠে। জবাবে রুপা তাকে তেমন কিছুই বলতে পারেনি ভেবে মনের বিষ তার দ্বিগুণ হয়ে যায়। প্রতিশোধের জ্বালাই যে তাকে ঘুমাতে দিচ্ছে না সেটাও এখন বুঝতে পারে। মনে মনে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয়,

— আগামী কাল গিয়ে তাকে পেলে উচিৎ শিক্ষা দিয়েই তবে শুনবো।

রুপার মনের আশাটা আর পুরা হলো না। আগামী কাল দুপুরে পুকুর পাড়ে গিয়ে কাউকে পাওয়া গেলো না। ছেলেটাকে দেখতে না পেয়ে রুপার মনটা কেমন যেনো বিমর্ষ হয়ে গেলো। তার কারণ কি প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া নাকি কাঙ্খিত কোনো ব্যক্তির সাক্ষাত থেকে বঞ্চিত হওয়া তা হয়তো সে নিজেও বলতে পারবে না। মানুষের মনের খেলা তার নিজের পক্ষেও বুঝা মুশকিল। মন মরা হয়ে শিমুল তলায় বসে আনমনে ছাগলে খাওয়া ফুলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছে এমন সময় হঠাৎ তার কানে ভেসে এলো সেই পরিচিত কণ্ঠ,

— যাও ধোপা যাও রে, কাপড় ধুয়ে দাও রে।

কণ্ঠটা শুনেই রুপার মনজগতে যেনো হঠাৎ একটা খুশির পুলক বয়ে গেলো। সেই খুশিকে সামলে নিয়ে জোর করে চেহারায় বিরক্তি প্রকাশ করে এদিক সেদিক তাকালো সে। কিন্তু আশেপাশে কোনো মানুষ তো দূরের কথা কোনো পশুপাখি পর্যন্ত দেখতে পেলো না। বদমাশ ছেলেটার রাক্ষস ছাগলগুলো পর্যন্ত নেই। তবে কি সে ভুল শুনেছে নাকি এই নির্জন জায়গায় ভূতের উপদ্রব আছে। ভূতের ভয় অবশ্য রুপাকে খুব বেশি কাবু করতে পারে না। তার মতো ডাকসাইটে মেয়ে মানুষ আর যাই হোক ভূতের ভয় পায় না। তবে ব্যাপারটার মধ্যে রহস্যের একটা গন্ধ পায় রুপা। সে বুঝতে পারে বদমাশটা আশেপাশেই কোথাও লুকিয়ে আছে।

— কিন্তু কোথায় লুকিয়ে থাকতে পারে!

মনে মনে ভাবে রুপা। আর তখনই আবারো শোনা যায়।

— আরে ঐ ধোপা!

শব্দটা কানে যাওয়া মাত্রই সেদিকে চোখ ফেরায় রুপা। শব্দটা আসছে পুকুরের মাঝখান থেকে। সেখানে এখানও পানি ঢেও খেলে যাচ্ছে। মানে বদমাশটা ওখানেই ডুব দিয়েছে।

— কতক্ষণ আর ডুব দিয়ে থাকবে একটু পরেই নিশ্চয় ভেসে উঠবে।

এমন ভেবে ঐ স্থানের দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকে রুপা। এভাবে বেশ খানিকটা সময় পার হয়ে যায় কিন্তু কেউ ভেসে ওঠে না। আসলে বাবুল ততক্ষণে ডুব সাঁতার দিয়ে পুকুরের কিনারায় গিয়ে দেহটা গলা পর্যন্ত পানিতে ডুবিয়ে কেবল মাথাটা এক ঝোপের মধ্যে বের করে লুকিয়ে আছে। রুপা ভাবে,

— এতক্ষণ তো কেউ পুকুরের পানিতে ডুব দিয়ে থাকতে পারবে না। তবে কি ... ?

এবার তার সত্যি সত্যিই গা ছমছম করে ওঠে। কিন্তু তখনই সে লক্ষ্য করে নিচে পুকুরের কিনারায় একটা ঝোপের উপর কয়েকটা জামা কাপড় ঝুলছে। গতকাল ছেলেটার গায়ে এগুলোই দেখেছিলো সে। তার মানে পুকুরে সে যে আছে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। বিড়বিড় করে রুপা বলে,

— জামা-প্যান্ট খুলে উদম হয়ে পুকুরে নেমে পড়েছে! আচ্ছা নচ্ছার তো।

তারপর পুকুরের পাড় বেয়ে সরু পথটা ধরে নিচে নেমে গিয়ে ময়লা জামা-কাপড় গুলো নিতান্ত ঘৃণা ভরে হাতে তুলে নিয়ে চিৎকার করে বলে,

— কোথায় আছো এক্ষুনি দেখা দাও। তা না হলে কিন্তু এগুলো পানিতে ফেলে দেবো।

রুপার সুন্দর কণ্ঠে দেখা দাও কথাটা শুনে বাবুলের মনটা উল্লাসিত হয়ে ওঠে। মনে হয় যেনো কোনো নায়িকা তার নায়ককে ডাকছে। কিন্তু জামা-কাপড় ফেলে দেবে কথাটা শুনেই সে ভীষণভাবে আতংকিত হয়। কেবল জামা-কাপড়গুলো ভিজে যাবে এই ভয়ে নয়। প্যান্টের পকেটে গতকালের আঁকা সেই ছবিটা আছে। বাড়িতে রাখা নিরাপদ মনে করেনি বলেই সাথে নিয়ে এসেছে ওটা। এখন দেখা যাচ্ছে এই অতি সতর্কতাই তার কাল হয়ে দাঁড়াতে পারে। জামা-কাপড়গুলো পানিতে ফেলে দিলেই পানিতে ভিজে ছবিটার বারোটা বেজে যাবে। শেষ হয়ে যাবে নব্য যুগের নতুন মোনালিসা। ঝোপের আড়াল ছেড়ে এক সাঁতারে মাঝ পুকুরে এসে কাকুতি মিনতি করে সে তাই বলে উঠলো,

— না, না। দোহাই তোমার। ফেলে দিয়ো না। ওটা ফেলে দিলে আমি বাড়ি যেতে

পারবো না।

রুপার মাথায় বিদ্যুতের চমক খেলে যায়। সত্যিই তো! জামা-প্যান্টগুলো যদি সে সত্যি-সত্যিই পানিতে ফেলে দেয় তবে দিনের আলো থাকা অবধি বাড়ি যাওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে ছেলেটার। সারাটাদিন পড়ে থাকতে হবে পানির মধ্যে। বদমাশ ছেলেটাকে চরম শিক্ষা দেওয়ার মোক্ষম একটা সুযোগ হাতে পেয়ে মনটা খুশিতে নেচে ওঠে তার। সেই সাথে গতকালের মতো হম্বি-তম্বি ছেড়ে আজ যে সে হাত জোড় করে কাকুতি মিনতি করছে এটা দেখে রুপার আনন্দ তো সীমা ছাড়িয়ে যায়। ভীষণ বড়াই করে সে বলে,

— গতকাল খুব দুঃসাহস দেখিয়েছো তুমি। আজ তোমার একটা হ্যাস্ত-ন্যাস্ত আমি করবোই।

কথাটা বলে জামা-কাপড়গুলো দুহাতে উঁচু করে পানিতে ফেলে দিতে উদ্যত হয় রুপা। বিচ্ছু মেয়েটা যে এমন একটা কান্ডজ্ঞানহীন কাজ করতে পারে বাবুলের সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে সে নিজেই তাই এবার একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজ করে ফেলে। দুহাত উঁচু করে বলে,

— না, না। ফেলো না। প্যান্টের পকেটে একটা জিনিস আছে ভিজে যাবে।

কথাটা বলেই জিভে কামড় দেয় বাবুল। চোরকে বাড়ির রাস্তা বলে দেওয়ার মতো অবস্থা হয়েছে তার। এমনিতেই মেয়ে মানুষের অনর্থক কৌতুহল একটু বেশি। বাবুলের কথায় রুপাও যে, পকেটের জিনিসটা কি তা দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠবে তা বলাই বাহুল্য। রুপা যদি এখন একটি বারও পকেট চেক করে তবে ছবিটা হাতে পেয়ে যাবে। আর তখন কি যে কান্ড করবে তা কে জানে। ছবিটা যে তারই এটা বুঝতে তার একটুও দেরি হবে না। বাবুলের ধারণাই সত্য হলো। রুপা তার প্যান্টের পকেটে তল্লাশী শুরু করলো। প্রথমে ডান পকেটে হাত দিয়ে কিছুই না পেয়ে সে এবার বাম পকেটে হাত দিলো। বাবুল ততক্ষণে ঢোক গিলতে শুরু করেছে। আজ যে সে কোন কপাল নিয়ে ঘুম থেকে উঠেছে কে জানে! ইতোমধ্যে বাম পকেট থেকে রুপা ভাজ করা কাগজটি বের করে এনেছে। তারপর কাপড়গুলো বগলে ধরে দুহাত দিয়ে কাগজের ভাজ খুলতে আরম্ভ করেছে। বাবুলের প্রাণটা তখন ওষ্ঠাগত। আর তখনই শোনা গেলো বোমা ফাঁটার

মত বিকট এক আওয়াজ,

— হায়, হায়। এ যে আমার ছবি। আরে ঐ শয়তান, বেয়াদব, বদমাশ, নচ্ছার, আমার ছবি আঁকা হয়েছে? তাও আবার এমন বিশ্রী পোশাকে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ। এত বড় সাহস!

তারপর প্রথমে ভাবলো, ছবিটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে কিন্তু এত সুন্দর ছবিটা সে কিছুতেই ছিঁড়ে ফেলতে পারলো না। হাজার হোক তার নিজেরই ছবি। খুব যত্ন করে আঁকা হয়েছে। সারা জীবনে আর কেউ এতটা যত্ন করে তার ছবি আঁকবে কিনা বা চেষ্টা করলেও আঁকতে পারবে কিনা তা কে জানে?

— কিন্তু ছবিটা এক রাখাল এঁকেছে। তার মতো রাজকুমারীর ছবি আঁকার কোনো অধিকারই নেই এই রাখালের। অত মনোযোগ দিয়ে তার চেহারাটা দেখা বা সেটা নিয়ে ভাবাই তার বিরাট অন্যায়। অনেক বড় অনধিকার চর্চা। ছবিটা তাই তার ছিঁড়ে ফেলাই উচিৎ।

নিজেকে বোঝায় রুপা। কিন্তু অনেক বুঝিয়েও নিজেকে সে কিছুতেই এই কাজে রাজি করাতে পারে না। ব্যর্থ হয়ে শেষে রাগ আর ঘৃণায় তার মনটা বিষিয়ে উঠলো। তার মনে হলো, আজও ছেলেটা তাকে হারিয়ে দিলো। রেগে-মেগে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে শেষে তাই সে বাবুলের জামা-কাপড়গুলো সত্যি সত্যিই পানিতে ফেলে দিলো।

— হায় হায়!

বলে বিকট একটা চিৎকার করে বাবুল সাঁতার কেটে জামা কাপড়গুলোর দিকে ছুটে গেলো। ডুবে যাওয়ার আগেই সেগুলো উদ্ধার করার জন্য। কিন্তু পুকুরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে সাঁতার কেটে আসতে তার অনেক্ষণ লেগে গেলো আর ততক্ষণে জামা-প্যান্ট দুটোই গভীর পানিতে তলিয়ে গেলো। কয়েকবার ডুব দিয়ে বাবুল জামা-প্যান্টগুলো তুলে আনার চেষ্টা করলো কিন্তু কিছুতেই সেগুলো খুঁজে পেলো না। পানির এত গভীরে কিছু তলিয়ে গেলে সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেক তল্লাশী করেও যখন সেগুলো খুঁজে পাওয়া গেলো না তখন মাথায় হাত দিয়ে আহত স্বরে সে বলে উঠলো,

— হায় হায়! এখন আমি বাড়ি যাবো কি করে?

তাকে অসহায়ের মতো আচরণ করতে দেখে রুপা খিল খিল করে হেসে উঠলো। আর চিৎকার করে বলল,

— চিন্তা নেই। আমি একটা বুদ্ধি দিচ্ছি। রাত পর্যন্ত পুকুরের পানিতে ডুবে থাকো। তারপর রাতের আধারে বাড়ি গেলে কেউ কিছু দেখতে পাবে না।

রুপার প্লানটা একেবারে অমূলক না হলেও সেটা যে কত কঠিন ব্যাপার তা বাবুলের বুঝতে বাকি থাকে না। পাষাণ মেয়েটা তাকে কত বড় শাস্তি দিতে চাচ্ছে সেটা ভেবে বাবুলের দাঁত রাগে কটমট করে ওঠে। এখন ভর দুপুর। অন্ধকার হতে পাঁচ/সাত ঘন্টা দেরি। এতক্ষণ পুকুরে পড়ে থাকলে তার শরীরের যে বারোটা বেজে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এখানে অপেক্ষা করা তাই তার পক্ষে সম্ভব নয়। তার চেয়ে কিছুটা সহজ একটা প্লান অবশ্য তার মাথায় হুট করে চলে আসে। রুপার কাঁধে একটা ওড়না ঝুলছে। কোনো পন্থায় সেটা নিতে পারলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। ওটাকে গামছার মতো পরে নিলেই নির্বিঘ্নে বাড়ি ফেরা যাবে। এভাবে গ্রামের এমাথা-ওমাথা যাতায়াত করাটা তার মতো এক গ্রাম্য কিশোর ছেলের পক্ষে বড় কোনো অপরাধ নয়। কিন্তু বিচ্চু মেয়েটা যে আপোসে ওড়নাটা দেবে না এটা নিশ্চিত। বুদ্ধি করে তার মন গলাতে হবে। বাবুল এবার সেই চেষ্টাই করে। যাত্রাপালার নায়কদের ডায়লোগ অনুসরণ করে তাদেরই ভাষায় বলে,

— হে রাজকন্যা দয়া করে আমাকে এতো বড় শাস্তি দেবেন নে। আমি আপনার ক্ষমা ভিক্ষা চাই। সেই সাথে ভিক্ষা চাই আপনার ওড়নাটি। যাতে ওটা পরে আমি বাড়ি যেতে পারি। দয়া করে বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করুন।

কথাটা বলে ভিক্ষুক যেভাবে থালা পাতে সেভাবে পানির ভিতর থেকেই নিজের দুটি হাত সামনে বাড়িয়ে দেয় বাবুল। তার কথা বলার ঢঙ আর হাত পাতার ভাব দেখে রুপা আর হাসি চেপে রাখতে পারে না।

হি হি করে হাসতে হাসতে বলে,

— কেবল মুখে ক্ষমা চাইলে তো হবে না। কান ধরে উঠবোস করতে হবে দশ বার।

ওষুধে কাজ করছে দেখে বাবুল কোনো সংকোচ না করেই দুহাতে নিজের দুই কান ধরে উঠবোস করতে লাগলো। উঠবোস তো নয় একে বলা যায় ডুবাভাসা। কান ধরে

বসার সময় সে পানির নিচে ডুবে যাচ্ছিলো আর উঠার সময় তার বুক পর্যন্ত উপরে ভেসে উঠছিলো। এমনতর উঠবোস দেখে রুপার হাসির মাত্রা দ্বিগুণ হয়ে গেলো। ছেলেটাকে নাজেহাল করে আজ খুব মজা পাচ্ছে সে। গতকালের পরাজয়ের শোধ তুলে নিচ্ছে বেশ করে। মনের সুখে সে গুণতে থাকে,

— এক, দুই, তিন ..

দশ পর্যন্ত গোনা হয়ে গেলে বাবুল আবারো আগের মতোই হাত পেতে মাথা ঝুঁকিয়ে ওড়নাটি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে।

এবার আর না করতে পারে না রুপা। কাঁধ থেকে ওড়নাটি খুলে নিয়ে দু হাত উঁচু করে ছুঁড়ে মারে বাবুলের দিকে। সাথে সাথেই বাবুল সাঁতরে এসে সেটা হস্তগত করে যাতে এটাও পানির নিচে তলিয়ে না যায়। তারপর ওড়নাটি হাতের মুঠোয় চলে আসলে অস্থির মনটা তার শান্ত হয়ে যায়। সাহায্যপ্রার্থীকে টাকা-পয়সা দিলে তারা যেভাবে হাতে পাওয়ার সাথে সাথে মুখে ঠেকিয়ে চুম্বন করে দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায় ঠিক সেই ভঙ্গিতে

— আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন

বলে বাবুল হাতের মুঠোয় ওড়নাটি নিয়ে দু'বার মুখে ঠেকিয়ে তাতে চুম্বন করে। সে হয়তো মজা করার জন্যই কাজটি করে কিন্তু তারই ভিন্ন অর্থ বুঝে রুপার মনটা হঠাৎ যেনো শিহরিত হয়। মনে মনে রাগও হয় কিছুটা। কিন্তু মুখে কিছুই বলে না।

ততক্ষণে বাবুল ওড়নাটা কোমরে বেধে গামছার মতো করে পরে নেয়। তারপর রুপার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দ্রুত সাঁতার কেটে পুকুরেই ঐ পারে চলে যায়। আর ডাঙায় পৌঁছেই দেয় ভোঁ দৌঁড়। সে চায় না মেয়েটা ওড়না পরা অবস্থায় তাকে দেখুক।

বেশ কিছুক্ষণ বাবুলের যাওয়ার রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে রুপা। মনটা আজ তার বেশ উৎফুল্ল। পাঁজি ছেলেটাকে আচ্ছামতো টাইট দেওয়া গেছে। কিন্তু বিনিময়ে নিজের ওড়নাটাই যে তাকে দান করে দিয়েছে এই ব্যাপারটা মোটেই ভাল লাগে না তার।

— তার মাথার ওড়না এখন রাখাল ছেলের পরনে!

মনে মনে একথা ভেবে রাগ-অনুরাগের মাঝামাঝি মিশ্রিত এক অনুভূতি খেলা করতে

থাকে রুপার মনে। তারপর তার মনে পড়লো ছবিটার কথা। সেটা তার হাতেই ছিলো। সেদিকে অপলকে তাকিয়ে থেকে রুপা বিড়বিড় করে বলে,

— এত সুন্দর ছবি কেউ আঁকতে পারে!

তারপর আবার নিজেকে সামলে নিয়ে দাঁতে দাত ঘসে বলে,

— এত বড় সাহস! একটা রাখাল হয়ে সে কিনা তার মতো রাজ কুমারীর ছবি আকে! তাও আবার এমন বিশ্রী পোশাকে! শায়েস্তা ওকে করতেই হবে।

এমন ভাবতে ভাবতে ছবিটা ভাজ করে হাতের মুঠোয় নিয়ে সেও বাড়ি চলে যায়।

৪.

বাড়ি ফিরে আর কোনো কাজেই রুপার মন বসলো না। প্রাইভেট পড়তে গেলো বটে কিন্তু সারাক্ষণ উদাস মনে বসে থাকলো। বাড়ি ফিরে টিভি দেখতেও বসলো না। সোজা চলে গেলো তার শোবার ঘরে। কিছুক্ষণ পায়চারী করে আর কিছুক্ষণ বিছানায় গড়াগড়ি দিয়ে সময় কাটানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু সময় যেনো কাটতে চায় না। প্রতিটা মিনিট যেনো একেকটা ঘন্টার মতো। শেষ রাতের দিকে হালকা একটু ঘুম এসে গিয়েছিলো তার। তখনই সে বাবুলকে নিয়ে স্বপ্ন দেখলো। অন্যরকম একটা স্বপ্ন। এই রাখাল ছেলেটা তার মন-মগজকে ব্যস্ত রেখেছে। এমনকি শান্তিতে ঘুমাতেও দিচ্ছে না। ভাবতেই নিজের উপর নিজের খুব রাগ হলো তার। তবে কি সে তাকে ধীরে ধীরে ভালবেসে ফেলছে?

— না, না। কখনও না।

নিজেকে বোঝায় রুপা। তার মতো রাজকুমারীর পক্ষে রাস্তার কোনো রাখাল ছেলেকে ভালবাসা সম্ভব নয়। স্কুলে কত সব বড়লোকের ছেলে আছে, মেধাবী ছাত্র আছে। রুপা ভাবে,

— প্রেম যদি করতেই হয় তবে তাদের সাথেই করবো।

বান্ধবীরা বলে, অনেক ছেলেই তার সাথে প্রেম করতে চায়। কিন্তু রুপা তাদের পাত্তা দেয় না। তারাও তার ধারে কাছে ভিড়তে সাহস পায় না। রুপার গর্ব-অহংকারের সুউঁচ্চ

প্রাচীর ডিঙিয়ে আর নারী সুলভ সহজাত লজ্জা-শরমের বাধ অতিক্রম করে তার ধারে কাছে ঘেঁষাও তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাকে পরাজিত করে তার অন্তরকে জয় করা তো দূরের কথা। অতটা বীরপুরুষ তারা নয়। অহংকারী রাজকুমারীকে বশ করার ক্ষমতা তাদের নেই। প্রেমের খেলায় বুদ্ধি খাটিয়ে নানা কৌশলে কোনো একরোখা বালিকাকে অনুগত প্রেমিকাতে পরিণত করার মতো ধৈর্য্য বা মনোবল কোনটিই তারা রাখে না। তাই তাদের কারো সাথে প্রেম জমে ওঠেনি রুপার। একটা বইতে রুপা পড়েছিলো,

— প্রেম হলো, নারী-পুরুষের মাঝে একটা খেলা যেখানে পুরুষ নারীকে বশে আনার চেষ্টা করে। পুরুষ চেষ্টা করে নারীর মন জয় করে তার দেহটাকে উপভোগ করার। আর নারী বাহ্যত চেষ্টা করে নিজেকে তার হাত থেকে রক্ষা করার। একবার পুরুষের হাতে ধরা দিলে তাকে সে এমনভাবে ব্যবহার করবে যে, সারাটা জীবন তার সামনে ছোট হয়ে থাকতে হবে। তার সামনে আর কোনো গর্ব-অহংকার বা মান-সম্মান অবশিষ্ট থাকবে না তার। কোনো নারীই তাই চায় না তার এমন অবস্থা হোক। তাই প্রেমের শুরুতেই সে নিজেকে দূরে রাখতে চায়। মনের মাঝে কামনা-বাসনা তার যতই তীব্র হোক বাস্তবে সে সহজে সামনে এগুতে চায় না। ভয়, লজ্জা আর অহংকার তার সামনে বাঁধা হয়ে দাড়ায়। অথচ প্রেমের মজা সেও বোঝে। তাই ভিতর থেকে তারও ইচ্ছা হয় প্রেম করতে। মনে-প্রাণে তাই সে চায় কেউ সাহস করে এগিয়ে এসে তার গর্ব অহংকার ও লজ্জা-শরমের প্রাচীরকে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিক। কৌশলে প্রেমের ফাঁদে ফেলে তাকে প্রেমের পরম সুখ আস্বাদনের সুযোগ করে দিক। এসময় যেসব সাহসী কিন্তু চালাক পুরুষ মানুষ কৌশলে এগিয়ে আসে নারী চরিত্র তাকেই ভালবাসে। তার সাথে প্রেম করে। যদিও সে সামাজিক বিচারে তার চেয়ে নিচু স্তরের হয়। বিপরীতে যে বিড়ালের মতো মিউ মিউ করে বা কোনো নিয়ম-নীতি না মেনে মৌচাকে হাতা মেরে একবারে মধু খেতে চায় সে শাহজাদা হলেও তার সাথে কোনো নারীই সত্যিকার অর্থে প্রেম জমাতে পারে না।

রুপা ভাবে,

— তার জীবনের সাথে এই কথা হুবহু মিলে যাচ্ছে। সে নিজে ভীষণ তেজী আর অহংকারী। সহজাতভাবেই কারো কাছে নিজেকে সপে দিতে তার মন সায় দেয় না।

তার গর্ব অহংকার কোনো পুরুষের সামনে নত হতে বাধা দেয়। সেই সাথে নারীসুলভ সহজাত লজ্জা-শরম আর সংশয় সংকোচ তো রয়েছেই। সবে মিলে কারো প্রেমিকা হওয়ার ব্যাপারে তার অন্তরে রয়েছে বাহ্যিক অস্বীকৃতি। অথচ প্রতিটা মেয়ের মতোই প্রেমের মজা সেও বোঝে। ভেতরে ভেতরে তাই সেও চায় তার জীবনে প্রেম আসুক। প্রেমাবেগে তার কোমল মনটা ভরে যাক। কিন্তু এ কাজে সে নিজ থেকে এগিয়ে যাবে না কখনই। স্বেচ্ছায় সহজে কাউকে সুযোগও দেবে না। তাহলে সাহসিকতার সাথে এগিয়ে এসে কৌশলে তার অন্তরটাকে জবর-দখল করা ছাড়া তার সাথে প্রেম করার আর কি কোনো উপায় আছে!

এতদূর ভেবে আতংকে শিউরে ওঠে রুপা। একমাত্র বাবুল ছাড়া অন্য কোনো ছেলের মধ্যে এমন আচরণ খুঁজে পায়নি সে। সেকারণেই বুঝি তাকে প্রথম দেখার পর থেকেই এতটা অস্থির হয়ে উঠেছে তার মন। তার অবচেতন মন হয়তো তাকে পছন্দই করে ফেলেছে। তবে কি সত্যি সত্যিই এক রাখাল ছেলে তার গর্ব-অহংকার আর সব লাজ-শরমের প্রাচীরকে ভেঙে চুরমার করে তাকে প্রেমের ফাঁদে আটকে ফেলেবে? ধনীর দুলালী রাখালীতে পরিণত হবে?

ভাবতেই মনটা বিষিয়ে ওঠে রুপার। কেমন যেনো একটা ঘেন্না ঘেন্না ভাব হয় নিজের উপর। নিজের অজান্তেই প্রতিবাদ করে ওঠে রুপা।

— না, না।

সব গর্ব অহংকারকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে কোনো রাখালের হাতের পুতুলে পরিণত হতে চায় না সে। প্রয়োজনে সে নিজেকে কঠোরভাবে শাসন করবে। যেভাবেই হোক নিজেকে এই রাখালের হাত থেকে রক্ষা করবে। এক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপটি হতে পারে তার আঁকা ছবিটা ছিঁড়ে ফেলা। কিন্তু একবারের জন্যও নিজেকে সে এ কাজে রাজি করাতে পারে না। বিড়বিড় করে বলে,

— ঠিক আছে ছিঁড়ে না হয় না-ই ফেললাম কিন্তু ছবিটার দিকে আমি একবারও তাকাবো না। আর তার সাথে দেখা করার জন্য পুকুর পাড়েও যাবো না।

মনে মনে এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে রুপা বিছানায় শুয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করে। ঘুমিয়েও পড়ে এক সময়।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই স্কুলে যাওয়ার জন্য তোড়-জোড় শুরু করে রুপা। নাস্তা সেরে বই-পত্তর গুছিয়ে বাইরে পা বাড়িয়েছে এমন সময় মনে পড়ে ছবিটার কথা। সেটা বালিশের নিচে রেখেছিলো। ঘর গোছানোর সময় মনিরার হাতে পড়লে সে যে কোথায় রাখবে তার ঠিক নেই। ছবিটা হয়তো চিরকালের মত হারিয়েই যাবে। একবার ভাবলো ছবিটা নিয়েই আসি। পরক্ষণেই নিজের মনকে শক্ত করলো রুপা।

— হারিয়ে গেলে যাক না। অশিক্ষিত রাখালের আঁকা ছবি। হারিয়ে যাওয়াই ভাল।

এমন ভেবে জোর করে নিজেকে বাড়ির বাইরে টেনে নিয়ে গেলো রুপা। তারপর সত্যি সত্যিই ছবিটা অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রেখে স্কুলে চলে গেলো। স্কুলে গিয়ে কিন্তু আর স্থির থাকতে পারলো না সে। সারাটা সময় কেবল এদিক সেদিক তাকিয়ে আর মন মরা হয়ে বসে থেকে কাটিয়ে দিলো। স্কুল ছুটির পর তড়িঘড়ি করে বাড়িতে এসে বালিশটা উঁচু করেই দেখলো ছবিটা নেই। তার মনের মধ্যে ধক করে উঠলো। কিসের একটা বেদনা যেনো উথলে উঠতে লাগলো। সারাটা ঘর তন্ন তন্ন করে খোঁজা শুরু করলো। তাতেও যখন পাওয়া গেলো না তখন চিৎকার করে ডেকে উঠলো,

— মনি, এই মনি।

ডাক শুনে মনিরা ছুটে আসলো তার ঘরে। ব্যাপার কি বুঝতেও পারলো। ঘরে ঢুকেই টেবিলে রাখা একটা বইয়ের ভিতর থেকে ছবিটা বের করে রুপার হাতে দিয়ে বলল,

— আহা, কি সুন্দর ছবি! কে এঁকেছে গো?

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে রুপা তাকে ধমক দিয়ে বলে উঠলো,

— সুন্দর না ছাই। কেমন বিশ্রী পোশাক দেখেছো?

পোশাকটা যে বিশ্রী মনিরা সেটা আগেও লক্ষ্য করেছে। তবে বিশ্রী পোশাকের কারণেই যে ছবিটার শ্রী বৃদ্ধি হয়েছে সেটাও সে লক্ষ্য করেছে। তাই ছবিটা তার ভাল লেগেছে। তবে ছবিটা যে একটা রাখাল ছেলে এঁকেছে সেটা জানলে তার প্রতিক্রিয়া কি হতো তা কে জানে? আর ছবিটা যে রুপার সেটাও কি সে বুঝতে পেরেছে?

একটা ছেলে যদি কোনো মেয়ের ছবি এমন বিশ্রীভাবে আঁকে তবে তার কি মানে হয় সেটাই চিন্তার বিষয়। বিশেষত যদি মেয়েটা হয় ধনীর দুলালী আর ছেলেটা হয় রাখাল

তবে তো চিন্তার কোনো শেষই নেই।

মনিরা তখনও হা করে ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে রুপা আবারো ধমক দিয়ে বলে,

— যাও যাও। নিজের কাজ করোগে।

মনিরা চলে যেতেই ছবিটা হাতে নিয়ে রুপা বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে দুহাতে ছবিটা ধরে সেদিকে অপলোকে তাকিয়ে থাকলো। সত্যিই সুন্দর ছবি। পেন্সিলের আঁচড় তো নয় যেনো মমতার পরশ বুলিয়েই ছবিটা আঁকা হয়েছে। তার মনের পর্দায় ভেসে উঠতে লাগলো গতকালের স্মৃতিগুলো। ঘটনার প্রতিটা অংশই যেনো তার নিকট মধুর এক অভিজ্ঞতা। পুকুরের পানিতে লুকিয়ে থেকে তার নাম ভাঙিয়ে ছড়া কাটা থেকে শুরু করে, পাজি ছেলেটার অন্য সব আচরণই যেনো এখন রুপার নিকট উপভোগ্য বিষয় বলে মনে হচ্ছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ছলে তার ওড়নায় মুখ ঠেকানোর বিষয়টা স্মরণ হতেই দেহ মন শিউরে ওঠে রুপার। কি যেনো এক পরম তৃপ্তি আছে এসবের মধ্যে। পরক্ষণেই হুশ ফেরে তার। রাগের চোটে দপ করে জ্বলে ওঠে সে। তার মনে হয় ছেলেটা ইচ্ছা করেই এমন করেছে। সেও নিশ্চয় বিষয়টা উপভোগ করেছে। নিজের মাথার ওড়না সে নিজে হাতে একটা অশিক্ষিত, অভদ্র, রাখাল ছেলের হাতে তুলে দিয়েছে আর সেই সুযোগে সে তার ওড়নাতে মুখ ঠেকিয়ে চুমু খেয়েছে ভেবে নিজের কাছেই নিজেকে ছোট মনে হয় রুপার। তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে সে। বিড়বিড় করে বলে,

— আজ তাকে শায়েস্তা করতেই হবে।

তারপর দাঁতে দাঁত চেপে রাগে গজ গজ করত করতে চলে গেলো সেই পুকুর পাড়ে। সেখানে গিয়ে অবশ্য কাউকে পাওয়া গেলো না। বদমাশটা আশে-পাশেই কোথাও হয়তো লুকিয়ে আছে বা পরে আসবে এমন ভেবে রুপা শিমুল তলায় বসে অপেক্ষা করতে লাগলো। প্রায় ঘন্টা খানেক অপেক্ষা করার পরও যখন সে আসলো না তখন ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেলো রুপার। আসলে রাগের ভান করে আসলেও বাবুলের সাথে দেখা করা আর তার সাথে খেলার ছলে ঝগড়া করাই তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো। তাতে যদি আরও কিছু রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হয় তবু কোনো আপত্তি নেই তার। তার অবচেতন

মন বরং এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তিই কামনা করছে বারংবার।

কিন্তু বাবুল না আসায় তার কিছুই হলো না। নচ্ছার ছেলেটাকে শায়েস্তাও করা গেলো না। বাধ্য হয়ে রুপা সেদিন কোন কিছু না করেই বাড়ি ফিরে গেলো। এভাবে কয়েকদিন পার হয়ে গেলো। প্রতিদিন রুপা এসে ঘন্টাখানেক পুকুর পাড়ে পাহারা দিয়ে যায়। কিন্তু বাবুলের কোনো দেখা নেই। মনে মনে বাবুলের উপর ভীষণ রাগ হয় রুপার। শুধু তাকে দেখার জন্য এতটা সময় অপেক্ষা করছে সে আর তার কি একবারও রুপাকে দেখতে ইচ্ছা করছে না। হঠাৎ আবার নিজেকে ধমক দেয় রুপা।

— এসব কি আবোল-তাবোল ভাবছি আমি? কে কাকে দেখার জন্য বসে আছে?

রুপা ভাবে,

— আমি তো বসে আছি বেয়াদব ছেলেটাকে উচিৎ শিক্ষা দেওয়ার জন্য। আর সে হয়তো সেই ভয়েই আর এদিকে আসছে না। এতদিনে বিজয়টা তাহলে আমারই হলো।

মনে মনে বিজয়ের আনন্দে উল্লাসিত হওয়ার চেষ্টা করে রুপা কিন্তু কিছুতেই তাতে সফল হয় না। ভেতরে ভেতরে একটা বেদনা যেনো থেকেই যায়।

রুপার সাথে দেখা করার প্রবল ইচ্ছা বাবুলের মনেও জাগেনি তা কিন্তু নয়। তারই স্মরণে সে নির্ঘুম রাত কাটিয়েছে এই কটাদিন। তবু তার সাথে দেখা করতে আসতে পারেনি। প্রথমত ঐ বিশ্রী ছবিটার ব্যাপারে জানা-জানি হলে রুপার ভাইয়ের হাতে পিটুনি খাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা তাকে আতংকিত করে। তবে এটাই তার না আসার একমাত্র কারণ নয়। যদি তাই হতো তবে সে চুপি চুপি এসে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকতো। তারপর যখন দেখতো রুপা একাই এসেছে তখন সেখান থেকে বের হয়ে এসে তাকে জ্বালাতন করতো। আসলে বাবুলের না আসার প্রধান কারণ ভিন্ন। রুপা তার যেসব জামা-কাপড় পানিতে ফেলে দিয়েছিলো সেগুলো বেশ পুরোনো হলেও বাইরে পরার উপযুক্ত কাপড় বাবুলের ঐ এক সেটই ছিলো। ছেড়া-ফাটা জামা-প্যান্ট বা জোড়া-তালি দেওয়া কাপড়-চোপড় আরো কিছু আছে যা বাড়িতে ব্যবহার করা যায় কিন্তু সেগুলো পরে বাইরে আসা যায় না। বিশেষ করে প্রেমিকার সামনে তো নয়ই। এদিকে দেহ থেকে জামা-প্যান্ট খুলে কিভাবে পানিতে পড়ে গেলো বাবা-মাকে সেটা বোঝাতেও তার বেশ সময় লেগে গেলো। অভাবের সংসারে সব খরচ সামলে অর্থ কড়ি সংগ্রহ

করতে তার বাবারও সময় লাগলো ক'দিন। সবে মিলিয়ে বাইরে আসার মতো এক সেট নতুন জামা-প্যান্ট বাবুলের হাতে আসতে কয়েক সপ্তাহ লেগে গেলো। তারপর হাটবারের দিন সন্ধ্যা বেলা তার বাবা নতুন এক সেট জামা-প্যান্ট নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। এসেই অযথা জামা-কাপড় হারিয়ে ফেলার কারণে মুখে অনর্গল গালাগালি নিক্ষেপের পাশাপাশি সদ্য কিনে আনা জামা-কাপড়গুলো বাবুলের দিকে নিক্ষেপ করে বললেন,

— নে হতভাগা। এখুনি গিয়ে আবার পুকুরের পানিতে তলিয়ে দিয়ে আয়।

আহ্লাদে বাবুল তখন আটখানা। বাবার মুখের গালিকে আশির্বাদ হিসেবে গণ্য করে আর তার নির্দেশকে পীর সাহেবের নির্দেশের মতোই মাথা পেতে মেনে নিয়ে সে জামা-কাপড়গুলো পরে এক দৌঁড়ে চলে গেলো পুকুরপাড়ে। জানে, এখন রুপা সেখানে থাকবে না। তবু তার মন মানে না। রুপা থাকবে না কিন্তু তার গায়ের গন্ধ তো থাকতে পারে? থাকতে পারে শিমুল তলায় মাটির উপর চঞ্চল এক কিশোরীর পায়ের ছাপ। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে পারে তার হাতের ছোয়া লাগা লাল টকটকে শিমুল ফুলগুলো।

পুকুর পাড়ে এসে বাবুল দেখলো সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে স্বাভাবিক নিরাবতা বিরাজ করছে। কেউ কোথাও নেই। দিনের বেলাই যেখানে মানুষজন আসে না সেখানে রাতের বেলায় জিন-পরী ছাড়া আর কে আসবে? কিন্তু না কোনো জিন-পরীও এখানে নেই এখন। মনে হচ্ছে যেনো পাখি-পক্ষিও নেই। তবে মাটির উপর কিছু শিমুল ফুল যে পড়ে আছে ভাল করে দেখলে তা বোঝা যায়। রুপার পায়ের ছাপ আছে কিনা তা দেখার কোনো উপায় নেই। এই নির্জনতার মধ্যে কিছুক্ষণ নিরবে বসে থেকে ব্যাথিত মনটাকে আরও ব্যথুর করে বাবুল বাড়ি ফিরে গেলো।

প্রতিদিনকার মতো পরদিন দুপুরেও রুপা পুকুড়পাড়ে গিয়ে হাজির হলো। এখন আর সে বাবুলের আশায় সেখানে যায় না। গত কয়েকদিন তার আশায় এসে তাকে না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে যেতে তার মনটা বেদনায় কাঠ হয়ে গেছে। এখন সে বাড়ি থেকেই হতাশ মনে পুকুড়পাড়ে আসে। শিমুল তলায় বসে আগের মতোই ফুল নিয়ে খেলা করে। ফুল সাজিয়ে সাজিয়ে মাটির উপর গোল বৃত্ত আঁকে, কখনওবা এমনকি পান পাতাও আঁকে। অন্তত সে মনে মনে এটাকে পানপাতাই বলে। কিন্তু পানের বোটাটা কখনও আঁকা হয় না তার। কেবলই ভুলে যায়। সেই সাথে মনটা সদা সজাগ রাখে।

ভাবে কখন হয়তো কোন দিক থেকে কেউ বলে উঠবে,

— যাও ধোপা যাও রে, কাপড় ধুয়ে দাও রে।

কথাটা ভাবতেই তার মনের মধ্যে বেদনা উথলে ওঠে। আর কোথাও কোনো শব্দ হলেই চমকে উঠে সেদিকে তাকায়। ভাবে এ বোধ হয় তারই পায়ের শব্দ।

প্রতিদিনকার মতো আজও শিমুল তলায় গিয়ে রুপা দেখলো চারিদিকটা ফাঁকা। কোথাও কোনো মানুষজন নেই। সবকিছুই আগের মতো নিরব আর নির্জন। পুকুরের দিকে তাকিয়ে দেখলো সেখানে কোনো ঢেও নেই। পুকুরের কিনারায় যে ঝোপটার আড়ালে সেদিন বাবুল লুকিয়ে ছিলো ভাল করে দৃষ্টি দিয়ে রুপা দেখলো সেখানেও কেউ নেই। তবু কি যেনো একটা ব্যাপার তার মনের মধ্যে খচখচ করতে লাগলো। মনে হলো সব কিছু আগের মতো নেই। কিছু একটা পরিবর্তন অবশ্যই ঘটেছে। ভাল করে লক্ষ্য করে রুপা ব্যাপারটা বুঝতে পারলো। গতকাল সে যে বড় পানপাতাটা এঁকেছিলো তার মাঝে আরেকটা ছোট পান পাতা আঁকা রয়েছে। এটা রুপার কাজ নয়। অনেক্ষণ শিমুল তলায় বসে থাকলে একাধিক পানপাতা হয়তো সে আঁকে কিন্তু একটার মধ্যে আরেকটা কখনও আঁকে না। রুপার মনের মধ্যে আনন্দের ঝিলিক খেলে গেলো। শয়তানটা আজ নিশ্চয় এসেছে। তার মনে হলো এখন হয়তো সে তার পিছনেই দাড়িয়ে রয়েছে। যে কোনো মুহুর্তে হয়তো ছড়া কেটে ব্যাঙ্গ করবে তাকে নিয়ে। ভাবতেই শিহরন খেলে যায় রুপার দেহে। চোখ বুঝে সে এমন একটা ঘটনার জন্য অপেক্ষা করে কিছুক্ষণ। কান পেতে শোনার চেষ্টা করে বাবুলের কণ্ঠ। কিন্তু না। কিছুই ঘটলো না। শেষে অধৈর্য্য হয়ে রুপা হঠাৎ পিছন ফিরে তাকালো।

— না। কেউ নেই।

মনটা আবার ব্যথায় ভরে গেলো তার। তবে কি তার ধারণা ভুল। মনের ভুলে সে নিজেই হয়তো দুটো পানপাতা এঁকেছে? রাগে ক্ষোভে দপ করে জ্বলে উঠলো রুপা। উবু হয়ে বসে দুহাতে সবগুলো পানপাতা ছিন্ন-ভিন্ন করে দিতে লাগলো। তার মনটা ডুকরে কেঁদে উঠলো। মাঝে মাঝে নাখ-মুখ দিয়ে ফুস-ফাস শব্দ আর চোখের কোনায় দু'এক ফোটা অশ্রু সেই কান্নার অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে লাগলো। হঠাৎ তার মনে হলো কে যেনো নিঃশব্দে তার সামনে এসে দাড়ালো। চমকে উঠে মাথা উঁচু করে তাকাতেই

তার চোখ জ্বল-জ্বল করে উঠলো। বাবুল দাড়িয়ে আছে তার সামনে। নতুন পোশাকে খুব সুন্দর লাগছে তাকে। আর দাঁড়াবার ভঙ্গি যেনো কোনো দিগ্বিজয়ী বীর। রুপার চোখে আজ বাবুলের সবটাই অন্যরকম লাগে। তার রোদে পোড়া তামাটে রঙ, লাল ঠোটে বাঁকা হাসি, পুরুষালী দেহের গঠন সবকিছুই তাকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করে। নিজেকে সে আর ধরে রাখতে পারে না। আবেগের অতিসহ্যে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে সজোরে লাফিয়ে পড়ে বাবুলের বুকের উপর। তারপর দুহাতে তাকে জাপটে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে। আর নেশাগ্রস্থের মতো কেবলই বলতে থাকে,

— বাবুল, আমার বাবুল।

সমস্ত গর্ব অহংকার আর লাজ শরমের বাধ ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেন মাটিতে ঝরে পড়ে তার দেহ আর মন ছেড়ে। মিশে একাকার হয়ে যায় পুকুর পাড়ের মাটিতে পড়ে থাকা আর সব ধূলি-কণার সাথে।

ঘটনার আকস্মিকতায় বাবুল তো খেই হারিয়ে ফেললো। পানের পাতাকে সে পানের পাতাই মনে করেছিলো। তার দাদী বড় একটা পানের পাতার মাঝে ছোট একটা পানের পাতা নিয়ে তার উপর চুন-সুপারী মাখিয়ে ছাগলের মতো চিবায়। আজ শিমুল তলায় এসে ফুল সাজিয়ে বড় একটা পানের পাতা আঁকা দেখে দাদীর অনুসরণেই সে মাঝে একটা ছোট পানপাতা এঁকে দিয়েছে। তবে অজানা কোনো কারণে বোটাটা আঁকা হয়নি তারও। তারপর রুপা আসছে বুঝতে পেরে পাশের ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছিলো যাতে দেখতে পারে তার সাথে তার বড় ভাই আসে কিনা। এই ওষুধে যে এমন কাজ দেবে তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

এখন রুপাকে ঠিক কি বলা যায় বা তাকে নিয়ে কি করা যায় সেটা সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। এমনকি রুপা তাকে যেভাবে জাপটে ধরে আছে দু'হাতে সেও তাকে সেভাবে ধরবে কিনা বা তার দেখাদেখি সেও হাউমাউ করে কাঁদবে কিনা সেটাও ঠিক করতে পারে না। আসলে প্রেম এমনই এক রহস্যময় জিনিস। শিকারীরা শিকারের দেখা পাওয়ার জন্য অনেক সময় বন্দুক উঁচিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করে তারপর হঠাৎ শিকারের দেখা পেয়ে অতি উত্তেজিত হয়ে হিতাহিত জ্ঞান পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। কোন দিকে তাক করবে আর কখন গুলি ছুঁড়বে সব ভুলে যায়। ছেলেরাও ঠিক তেমনই। মেয়েদের ফাঁদে ফেলার জন্য রাতভর চিন্তা-ভাবনা করে নানা কৌশল বের করে। কিন্তু

যখনই মেয়েরা সেই টোপ গিলে তার হাতে ধরা দেয় তখন সে এতটাই বোকা হয়ে যায় যে, কিছু করা তো দূরের কথা বলার মতো কোনো কথাও খুঁজে পায় না।

ততক্ষণে রুপার কান্না থেমে গেছে। তারপরও সে বাবুলের বুকের উপর মাথা রেখেই দাঁড়িয়ে থাকে। প্রেমিকের বুকে মাথা রেখে দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে যে এত মজা আছে এটা তার জানা ছিলো না। প্রেমের গল্প যেকটা পড়েছে তাতেও এই সুখের কোনো বর্ণনা দেওয়া হয়নি। দেওয়ার চেষ্টা করলেও কেউ দিতে পারবে না। এর স্বাদ ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। রুপার মনে হয় বাবুলের বুকের উপরে মাথা রেখেই সে সারাটা জীবন পার করে দিতে পারবে। চোখ বুজে সে তাই বাবুলকে যতটাসম্ভব চেপে ধরে দাঁড়িয়েই থাকে। সেই সাথে সে এটাও আশা করেছিলো যে বাবুল এতক্ষণে তার মাথা ও পিঠে হাত বুলাতে শুরু করবে। কিন্তু অনেকক্ষণ পরও যখন দেখলো বাবুল কিছুই করছে না তখন বিরক্ত হয়ে তাকে ছেঁড়ে দিয়ে তার কাঁধে দুটি হাত রেখে জোরে ধাক্কা দিয়ে বলল,

— ধুৎ। আস্ত গাধা একটা।

সেই ধাক্কা সামলাতে না পেরে বাবুল চিৎপটাং হয়ে মাটির উপর পড়ে গেলো। তারপর দুই হাতে পিছনে ঠেস দিয়ে আর দুটি পা উঁচু করে বোকার মতো বসে থাকলো। তাকে ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে রুপা খিলখিল করে হেসে উঠলো। তারপর ছড়া কেটে বলল,

— ব্যাঙ থুবরী ব্যাঙ, তুলে দিলো ঠ্যাঙ।

কথাটা বাবুলের যথেষ্ট গায়ে লাগলো। প্রেমের প্রথম ধাক্কাটা এতক্ষণে সে সামলে নিয়েছে। উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের পোশাকটা ঝাঁড়তে ঝাঁড়তে বলল,

— ইস! ময়লা করে দিলে। এ কাপড় আজ তোমাকেই ধুতে হবে।

কথা শুনে রুপা ঠোঁট বাঁকিয়ে তাচ্ছিল্ল প্রকাশ করে বলল,

— বা রে! আমি কি তোমার বউ যে, তোমার কাপড় ধুয়ে দেবো?

কথাটা শুনে বাবুলের মনটা ভীষণভাবে রোমাঞ্চিত হলো। এ যেনো তার বউ হওয়ার তীব্র আকঙ্খারই বহিঃপ্রকাশ। মাথা তুলে একবার সে রুপার দিকে তাকালো। তার

হীরা ঝলমলে রুপ, আর তাকিয়ে থাকার ভাবভঙ্গি বাবুলকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করলো। হঠাৎ সে দৌঁড়ে আসলো রুপাকে ধরার জন্য। তারপর

— কাপড় আজ তোমাকে ধুতেই হবে

বলে রুপাকে জাপটে ধরলো সে।

কিছুটা ভাললাগা আর কিছুটা লজ্জায় মেখে রুপা এ আলিঙ্গনকে উপভোগও করলো আবার হালকাভাবে নিজেকে ছাঁড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টাও করতে লাগলো। তারপর বাবুলের হাতের বন্ধন একটু হালকা হয়ে গেলে নিজেকে ছাঁড়িয়ে নিয়ে এক দৌঁড়ে দূরে সরে গিয়ে খিল খিল করে হেসে বলল,

— আমি ধোপা নই রে যার কাপড় সে ধোও রে, ।

বলে আবারো হিহি করে হাসতে লাগলো। আবারো তার দিকে ছুঁটে গেলো বাবুল। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ চলল ইদুর বিড়াল খেলা। এভাবে তারা যে কখন পুকুর পাড়ের ঘনো ঝোপটার কাছে এসে পড়েছে তা যেনো কেউ খেয়ালই করেনি। আসলে রুপাই করেছে কাজটা। বাবুলকে নিরাপদে যা খুশি করার সুযোগ দেওয়ার জন্যই ইদুর বিড়াল খেলার ছলে সে তাকে টেনে এনেছে এখানে। তারপর এমন সব অঙ্গ-ভঙ্গি করতে শুরু করেছে যার অর্থ একটু ভিন্ন। হঠাৎ ব্যাপারটা লক্ষ্য করে বাবুলের সমস্ত শরীর শিরশির করে উঠলো। কয়েকদিন আগেও এই মেয়েটাকে কাছে পাওয়া আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার চেয়েও বেশি অসম্ভব মনে হয়েছিলো তার কাছে। কিন্তু এখন সে স্বেচ্ছায় সব কিছু তার হাতের মুঠোর তুলে দিতে চাচ্ছে দেখে আবেগের অতিসহ্যে হুশ হারিয়ে ফেলে সে। আর যেনো তর সই না তার। ছুটে গিয়ে সে রুপাকে জড়িয়ে ধরে তার সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। সেই সাথে চোখে-মুখে বুলিয়ে দিলো ঠোটের পরশ। রুপাও তার সাথে অংশগ্রহণ করলো সমানভাবে। ধীরে ধীরে বাবুলের চোখে-মুখে ফুটে ওঠে এক অন্য রকম পরিবর্তন। কিছুক্ষণ অপলকে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে রুপা। অদৃশ্য কোনো কারণে তার মুখের এই পরিবর্তনের অর্থ বুঝতে পারে সে। আর সবকিছু জেনে-বুঝেই বিনা শর্তে বাবুলের হাতে নিজেকে সমর্পন করে দেয়। নিমিষেই ধনীর দুলালী এক রাখালীতে পরিণত হয়।

৫ .

হঠাৎ বাবুল লক্ষ্য করে সে একটা বড় হলরুমে চেয়ারে বসে আছে। তার সামনে একটা বড় টিভির মতো জিনিস। তাতে অনেকগুলো ছবি রয়েছে। তার মধ্যে একটা তার আর রুপার। ছবির দৃশ্যটা খুব মিষ্টি। রুপা তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিচ্ছে আর মাঝে লাল লাল ফুল সাজিয়ে একটা পানপাতা আঁকা রয়েছে। এটা তারই জীবনের বাস্তব একটা ঘটনা। ঘটনাটা কখন কোথায় ঘটেছে সব মনে পড়ে তার। মনে পড়ে রুপার সাথে ঘটে যাওয়া সকল ঘটনা। তারপর হঠাৎ নিজের শরীরের দিকে দৃষ্টি পড়ে তার। নিজের হাত-পা আর পোশাক-আসাক দেখে সে যেনো চমকে ওঠে। নিজেকে সে হালকা-পাতলা একটা কিশোরের বদলে স্বাস্থ্যবান একজন যুবকের রুপে দেখতে পায়। তার উপর আবার রাখালের বদলে রাজদুলালের সাজ। ভীষণভাবে চমকে ওঠার আগেই তার সব ঘটনা মনে পড়ে। সে যে জান্নাতের রাজ্যের এক রাজা যার আসল নাম মজিদ আর বাবুল যে তার কল্পিত একটা চরিত্র এবং তার রাখাল জীবনটা একটা সিনেমা বা স্বপ্নের মতো এসব বিষয়ের সাথে সাথে সেই স্বপ্নের ভুবনে রুপা নামে এক মেয়ের সাথে কি যে মধুর সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলো সেটাও স্মরণ হলো তার। ভাল একটা স্বপ্ন দেখলে যেমন তার রেশ কাটতে বেশ খানিকটা সময় লাগে। মজিদের ক্ষেত্রেও ঘটলো ঠিক তাই। বেশ কিছুক্ষণ চোখ বুজে থেকে মনে মনে সম্পূর্ণ ঘটনাটা আগা-গোড়া স্মরণ করলো কয়েকবার। তারপর মাথা তুলে মনিটরের দিকে দৃষ্টি দিলো। ছবির রুপার দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকলো বেশ কিছুক্ষণ। রুপার প্রতি ভীষণ মমতায় যেনো তার অন্তরটা বরফের মতো বিগলিত হলো। নিজের অজান্তেই তার ছবিটার উপর পরম তৃপ্তিতে হাত বুলাতে থাকলো সে। একটু আগেই পুকুড়পাড়ে রুপার সাথে কাটিয়ে আসা সময়গুলো তার কাছে মনে হলো হাজার হাজার হুরকে আলিঙ্গন করার চেয়ে অধিক রোমাঞ্চকর। অধিক উপভোগ্য। জান্নাতের রাজ্যে আর কি নেয়ামত লুকানো আছে কে জানে!

পাশেই ফেরেশতা নির্বিকারভাবে দাড়িয়ে আছে। মানুষের এসব গভীর আবেগ-অনুভূতি আর অনর্থক কাজ-কর্মের সাথে তার পরিচয় আছে। তাই সেসবের অর্থ না বুঝলেও দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। মজিদ এখন কি করবে সেটাও সে জানে। তা অবশ্য মস্তিষ্ক রিডিং এর কারণে নয়। আসলে এসব স্বপ্নের ভুবন থেকে ঘুরে এসে বেশিরভাগ

মানুষ যা করতে চায় সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকার কারনে সে জানে মজিদ এখন কি করবে।

রুপাকে দেখে যেনো আর স্বাদ মেটে না মজিদের। ঘুমের ঘোরই যেনো আর কাটতে চায় না তার দুচোখ থেকে। হঠাৎ আঙ্গুল দ্বারা আবারো ছবিটার উপর আঘাত করে সে। সাথে সাথেই আবারো ঢুকে যায় আগের ঘটনায়। আবারো সে এক রাখালের বেশে লাঠি দিয়ে ফুল পাড়তে থাকে। কোনো কিছুই স্মরণ থাকে না তার। সম্পূর্ণ নতুনভাবে শুরু হয় আগের ঘটনাটি। এই ঘটনা যে তার জীবনে আরেকবার ঘটেছে সেটাও এখন আর জানে না সে। এর পরে কি হবে সেটাও সে বলতে পারে না। এভাবে একের পর এক দৃশ্যপট পরিবর্তীত হতে হতে পৌঁছে যায় ঘটনার শেষ দৃশ্যে। আবারো সে সম্পূর্ণ নতুনভাবে উপভোগ করে অসম প্রেমের সেই পরম তৃপ্তি। তখন তার মনে হয় এ স্বাদ যেনো জীবনে আর কখনও পায়নি সে। বাস্তব জীবনে ফিরে আসার পর দুটো ঘটনাই তার স্মরণে আসে পরপর দুই রাতে একই রকম দুটো স্বপ্নের মতো। একই রকম তৃপ্তি আর একই রকম অভিজ্ঞতার দুটো পৃথক স্মৃতি। দুটোই সমান তৃপ্তির সমান উপভোগের। তার মনে হয়, এই ঘটনা হাজার বার ঘটুক তার জীবনে। পাগলের মতো বারংবার মনিটরে আঘাত করতে থাকে সে। বারবার রচনা করতে থাকে ধনীর দুলালী অপরুপা সুন্দরী রুপার সাথে পুকুড় পাড়ে ঝোপের আড়ে হতদরিদ্র এক রাখাল ছেলের প্রেমকাহিনী। কতবার যে মজিদ স্বপ্নের ভুবনে রুপার সাথে প্রেম করলো তার গণতি নেই। তারই স্মৃতিতে নিজের স্মৃতির পাতায় প্রেমকাহিনীর এক মালাই গেঁথে ফেললো সে। যেভাবে একের পরে এক লাল লাল ফুল সাজিয়ে রুপা পানের পাতা একছিলো।

ফেরেশতা নির্বিকারভাবে দাড়িয়ে ছিলো। তার দৃষ্টিতে এসব কাজ এমনিতেই অনর্থক। তার উপর একই কাহিনী বারংবার পুনরাবৃত্তি করা তো পুরাপুরি অযৌক্তিক। আরো কত ছবি রয়েছে সেগুলোতে কেনো ঢুকছে না সে? তবে তো নতুন নতুন সব অভিজ্ঞতা হাসিল হতো তার। আসলে প্রেমের আবেশে কোনো মেয়ে যখন কারো সম্পূর্ণ হৃদয়টা অধিকার করে নেয় তখন মানুষ কেমন আচরণ করে তা তার জানা নেই। দৈহিক সম্পর্ককে গুরুত্ব দিলে সকাল-বিকাল এমন পালা বদল খুব স্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু প্রেমের সম্পর্ক যতটা না দৈহিক তার চেয়ে অনেক বেশি আত্মিক। দুটি মন পরস্পরে মিশে একাকার হয়ে যাওয়ার নামই হলো প্রেম। কোনো মেয়ে যখন এভাবে কারো

মনকে অধিকার করে নেয় অন্য কোনো মেয়ের দিকে তখন আর তার দৃষ্টি পড়ে না। এই আবেগে ভাটা পড়লে হয়তো আবারো অন্য কারো দিকে ঝুঁকে যেতে পারে মন। কল্পিত চরিত্র হলেও রুপা মজিদের মনটাকে সম্পূর্ণভাবে দখল করে নিয়েছে। অন্য কোনো ছবির দিকে তাই তার দৃষ্টি পড়ে না। জান্নাতের আর সব হুর-পরীদের কথাও বেমালুম ভুলে বসে সে। রুপার কাছেই তার মনটা যেনো বাঁধা আছে। কতদিন এমন অবস্থা থাকবে কে জানে।

আরো একবার স্বপ্নের জগত থেকে বাস্তবে ফিরে এলো মজিদ। চোখে-মুখে তখন তার মাদক নেশার মতো ভাব। রুপার স্মৃতি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সেই ঘোর কাটতেই দৃষ্টি মেলে তাকালো মজিদ। তার নজরে পড়লো, জান্নাতের আকর্ষণীয় সব জিনিস। মনে পড়লো এই জগতের বাস্তব চিত্র। ঝলমলে আলো, বিশাল-বিরাট ভবন, পঙ্খীরাজ ঘোড়া, হীরা মতির অলংকার ইত্যাদি সব চমৎকার জিনিসের কথা মনে হলো তার। সে ভাবলো,

— এগুলো দেখলে রুপা কেমন খুশি হবে? তাকে কি এই জগতে নিয়ে আসা যায় না? কল্পিত ছায়ামূর্তি থেকে মূর্তিমান মানুষে পরিণত করে বাস্তব জীবনের স্বাদ কি তাকে উপভোগ করানো যায় না? প্রেমিকা হিসেবে কি স্থান দেওয়া যায় না অন্যসব স্ত্রী আর হুর-পরীদের মাঝে? রাখালের ছেলে জেনেও তার কাছে প্রেম নিবেদনের পুরষ্কার হিসেবে এতটুকু কি তার জন্য করতে পারে না সে?

তার মনে পড়ে দুনিয়ার জীবনে সে হাদীসে পড়েছে। জান্নাতে বায়দাখ নামে একটি নদী থাকবে। সেখানে ইয়াকুতের সব গুম্বুজ থাকবে। তার মধ্যে গাছের চারা বা ফুলের কুড়ির মতো গজিয়ে উঠবে সুন্দরী বালিকার মূর্তি। তার মধ্যে কোনোটি কারো পছন্দ হলে তার কব্জির উপর হাত রাখলেই সে প্রাণ ফিরে পাবে এবং ঐ ব্যক্তির সাথে চলে যাবে। মজিদ ভাবে,

— এভাবে যদি মূর্তির মাঝে প্রান সঞ্চার করা যায় তবে চলচ্চিত্রের কল্পিত একটা চরিত্রকেও বাস্তবে রুপদান করা যেতে পারে নিশ্চয়। সিনেমার দৃশ্য থেকে বের করে বাস্তব জগতে নিয়ে আসা যেতে পারে তাকে।

রুপাকে ঐ ছবির দৃশ্য থেকে বাস্তবে বের করে আনার জন্য মনটা তার ব্যকূল হয়ে

ওঠে। ভীষণ উৎকণ্ঠা নিয়ে ফেরেশতার দিকে তাকায় সে। ফেরেশতা তার মুখের দিকে তাকিয়ে মনের কথা বুঝে ফেলবে জেনে মজিদ মুখে কিছুই বলে না কেবল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করে,

— কি বলো, এটা কি সম্ভব?

প্রশ্ন শুনে ফেরেশতা মোটেও অবাক হলো না। এসব কল্পনার রাজ্য থেকে ঘুরে এসে প্রায় আশি ভাগ মানুষই এমন উদ্ভট ইচ্ছা ব্যক্ত করে। কল্পনাকে বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে জটিল একটা খিচুড়ি পাঁকিয়ে কি যে মজা তারা পায় তা তারাই বলতে পারে। মানুষের অন্যান্য কাজের মতোই এটাও বুঝতে পারে না সে। স্বাভাবিকভাবেই তাই সে বলে,

— জান্নাতের জীবনে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। কল্পনার এই মেয়েটিকে বাস্তব জীবনে ফিরিয়ে আনাটাও অসম্ভব নয়।

কথাটা শুনে দু'চোখ চকচক করে ওঠে মজিদের। কথার মাঝেই সে বলে ওঠে,

— কিন্তু কিভাবে?

কথার মাঝে বাধা পেয়েও কিছুমাত্র বিরক্ত না হয়ে ফেরেশতা বলতে থাকে,

— তাকে জড়িয়ে ধরে আপনি মুখে কেবল বলবেন, হে আল্লাহ আমাদের তুলে নাও। সাথে সাথেই আপনারা দুজন এই জীবনে চলে আসবেন।

ফেরেশতা আরো কিছু বলতে চাচ্ছিলো কিন্তু সেগুলো শোনার মতো মানসিকতা মজিদের অবশিষ্ট ছিলো না। তড়িঘড়ি করে সে ছবিতে স্পর্শ করে আবারো ফিরে গেলো সিনেমার জগতে। ফেরেশতা নির্বিকারভাবে তাকিয়ে থাকলো চেয়ারে বসে থাকা মজিদের দিকে। সামান্য কিছু সময়ের জন্য তার দেহটা যেন অসাড় হয়ে গেলো। তারপরই নিমিষেই ঘুম থেকে জেগে ওঠার মত চেতন হয়ে ফিরে এলো তার বাস্তব জগতে। যদিও মজিদের দিক থেকে সে সম্পূর্ণ ঘটনাটি শেষ করেই এসেছে। কল্পনার জগতে কাটিয়ে এসেছে কটা দিন। তাতে আনন্দও পেয়েছে আগের মতোই। কিন্তু যখন তার মনে পড়লো এবার সে রুপাকে আনতে গিয়েছিলো আর দেখলো তার সাথে কেউ আসেনি তখন বিরক্ত হলো সে। আসলে পুরা ঘটনার মধ্যে কখনও তার মনেই হয়নি যে সে রুপাকে নিয়ে যেতে এসেছে। কিন্তু ফিরে এসেছে খালি হাতে। তাকে জড়িয়ে ধরে "হে আল্লাহ

আমাদের তুলে নাও" এমন দোয়াও তাই করা হয়নি। ফেরেশতার দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকাতেই ওজর পেশ করার স্বরে সে বলল,

— আপনি আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই ছবিতে টিপ দিলেন। মেয়েটির স্মৃতি সাথে না নিয়েই যদি আপনি ওখানে চলে যান তবে কাহিনীতে ঢুকেই তাকে চিনবেনই বা কি করে আর তাকে নিয়েই বা আসবেন কি করে?

মজিদ নিজের ভুলটি বুঝতে পারে। তড়িঘড়ি করে বলে,

— ঠিক আছে তবে আমার সম্পূর্ণ স্মৃতি শক্তি বহাল রেখেই ওখানে ঢুকিয়ে দাও।

ফেরেশতা বললো,

— সম্পূর্ণ স্মৃতি শক্তি নয় ...

মজিদ হাত তুলে বাধা দিয়ে বলল,

— যা বলছি তাই করো। এবার আর কোনো ঝুঁকি নিতে চাই না আমি।

ফেরেশতার আর কিছুই বলার নেই। এবার স্বপ্নের ভুবনে গিয়েও মজিদের যাতে পূর্বের সব কথা স্মরণ থাকে তিনি সেই ব্যবস্থায় করলেন। ছবিতে স্পর্শ করার সাথে সাথেই মজিদ দেখলো, সে শিমুল তলায় লাঠি হাতে ফুল পাড়ছে আর কয়েকটা ছাগল সেগুলো গিলে খাচ্ছে। তার মনে পড়লো, সে আসলে জান্নাতের রাজ্যের এক রাজা। এখানে সাময়িক সময়ের জন্য বাবুল নামে এক রাখালের বেশে অভিনয় করছে। এই ভুবনে রুপা নামের এক মেয়ে আছে। তার সাথে তার অনেক সুখকর স্মৃতি রয়েছে। খানিক বাদেই সে এখানে চলে আসবে। রুপার কথা মনে হতেই তার মনটা তার সাথে দেখা করার জন্য ব্যাকূল হয়ে ওঠে। মনে পড়ে তার ঝগড়া করা, ছড়া কেটে ব্যাঙ্গ করা, ফুল সাজিয়ে পান পাতা আঁকা ইত্যাদি সকল কথা। এতো সুন্দর সুন্দর লাল লাল ফুলগুলো ছাগল দিয়ে খাইয়ে দিতে তাই একদম ইচ্ছা হয় না মজিদের। সে লাঠি দিয়ে ছাগলগুলো তাড়িয়ে দিয়ে বেশ কটা ফুল পেড়ে তা সাজিয়ে একটা বড় সাইজের পানপাতা একে তার মাঝে বরের মতো বসে অপেক্ষা করে রুপার জন্য। কিন্তু রুপা যেনো আর আসে না। ভীষণ অস্থির লাগে মজিদের। আসলে পূর্বের দিনগুলোতেও রুপা কিছুক্ষণ পরেই এসেছিলো কিন্তু তখন তো আর মজিদ তার অপেক্ষায় ছিলো না তাই অস্থির লাগেনি

কিন্তু আজ সে তার অপেক্ষায় আছে বলেই সময়টা দীর্ঘ মনে হচ্ছে। পূর্বের কাহিনীগুলোতে শেষের দিনগুলোতে তার জন্য অপেক্ষা করে রুপা কেমন অস্থিরতা অনুভব করেছে আজ সে তার কিছুটা বুঝতে পারে। তার মনে হয় আজ যেনো রুপা সেই প্রতিশোধই নিচ্ছে তার উপর। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে হঠাৎ খসখস শব্দ শুনে ঘুরে তাকাতেই মজিদ দেখলো, পাশের ঝোপের আড়াল থেকে বের হয়ে এসেছে রুপা। তাকে দেখে আনন্দের অতিসহ্যে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে মজিদ

— রুপা আমার, জান আমার।

বলে ঝাপিয়ে পড়লো রুপার বুকে।

কাণ্ড দেখে রুপা তো ভীষণ হকচকিয়ে গেলো। অপরিচিত একটা বখাটে ছেলে তাকে জাপটে ধরেছে দেখে বিকটভাবে চেঁচিয়ে উঠলো সে। তারপর দু'হাতে তাকে জোরে ঠেলে ফেলে দিয়ে মারাত্মক মারাত্মক সব গালাগাল নিক্ষেপ করতে করতে দৌঁড়ে পালালো বাড়ির দিকে।

মজিদ বুঝতে পারে ভুলটা কোথায় হয়েছে। তার স্মরণ শক্তিতে রুপার স্মৃতি থাকলেও রুপার স্মরণ শক্তিতে তো এখনও তার স্মৃতি নেই। সে তো আর তাকে চেনে না। তার এই আচমকা আক্রমণে তাই পিলে চমকে গেছে তার। এতটাই চমকে গেছে যে পালিয়ে যাওয়ার সময় বড় ভাইকে দিয়ে পিটুনি খাওয়ানোর কথাটা পর্যন্ত বলতে ভুলে গেছে।

কথাটা বলতে ভুলে গেলেও কাজটা করতে কিন্তু ভুললো না রুপা। আজ সে কথায় নয় কাজেই প্রমাণ করে দিলো। হঠাৎ মজিদ দেখলো, রুপা আবার ফিরে এসেছে। কিন্তু এবার সে একা নয়। সাথে নিয়ে এসেছে মোটা-সোটা আরেকটা মেয়ে মানুষ। সে যে তার মা নয় বা বড় বোন নয় তা তার পোশাক দেখেই বোঝা যাচ্ছে। হয়তো তাদের বাড়ির কাজের মেয়েই হবে। তা সে যাই হোক, হাব-ভাব তার ভালো নয় মেটেও। একটা রুটি বেলা বেলুন হাতে ভীষণ রাগে ফোঁস ফোঁস করতে করতে এগিয়ে আসছে সে।

— মেয়ে মানুষের গাঁয়ে হাত দিয়েছিস। ওড়ে হতচ্ছাড়া, শয়তান, বেয়াদব, নচ্ছার ..

ইত্যাদি ভয়ানক সব গালাগাল দিতে দিতে সেই মেয়েটা যেভাবে বেলুন হাতে হন হন করে মজিদের দিকে হেটে আসছে যে মজিদের মনে হয় আজ বোধ হয় মেয়ে মানুষের

হাতে বেলুন পেটা না খেয়ে কোনো উপায় নেই। সাথে সাথে সে দু'হাত তুলে বলে,

— হে আল্লাহ আমাকে তুলে নাও।

তখনই মজিদ বাস্তবে ফিরে আসে। তারপর রাগতভাবে চোখ কটমট করে তাকায় ফেরেশতার দিকে। রাগের কারণ অবশ্য ফেরেশতা বুঝতে পারেন। এখানে অনিয়ম একটা হয়েছে বটে। সম্পূর্ণ স্মৃতি নিয়ে কাহিনীতে ঢোকা তার ঠিক হয়নি। এমন করলে নিজেকে কাহিনীর ঘটনার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে কষ্ট হয়। কিছু ভুল-ভ্রান্তিও হয়ে যায় অনেক সময়। তার ফলাফলে কাহিনীর উদ্দেশ্য হয়তো সফল হয় না কিন্তু তাই বলে কোনো বিপদাপদ ঘটে এমনও নয়। মজিদের ক্ষেত্রেও কোনো বিপদ ঘটেনি। তার আগেই সে দ্রুত দোয়া পড়ে পালিয়ে এসেছে। আসলে পালিয়ে না আসলেও কিছুই হতো না। বিপদের ঠিক আগ মুহর্তে স্বয়ংক্রীয়ভাবে শেষ হয়ে যেতো কাহিনী আর এমনিতেই সে ফিরে আসতো বাস্তব জীবনে যেভাবে কাহিনীর শেষে দোয়া পড়া ছাড়াই এমনিতেই বাস্তবে ফিরে আসে সে।

এতক্ষণে মজিদ বুঝতে পারে ব্যাপারটা ছেলেখেলা নয় মোটেও। প্রেমিকাকে তার বাড়ি থেকে তুলে আনার কাজটা চিরকালই একটু জটিল। ঠান্ডা মাথায় চিন্তা-ফিকির করে এবার ভালো মতো প্লান-প্রোগ্রাম করে তাই তাকে আনতে যেতে হবে। ফেরেশতা তাকে সব কিছু বুঝিয়ে দেয়। এবার তার কথা খুব মনযোগ দিয়ে শোনে মজিদ। সম্পূর্ণ স্মৃতি নয় তাকে কেবল এতটুকু স্মরণ রাখতে হবে যে, কল্পনার জগতে যার সাথে প্রেম হবে তাকে সে আকাশের রাজ্য তথা জান্নাতে নিয়ে যেতে এসেছে। এর নিয়ম হলো, প্রেম হওয়ার পর প্রেমিকাকে জড়িয়ে ধরে দুহাত তুলে বলতে হবে "হে আল্লাহ আমাদের তুলে নাও"।

আরও একটা বিষয় মনে পড়ে মজিদের। কাহিনীতে মজিদের যে রুপ বাস্তব জগতে এসে যদি রুপা তাকে সে রুপে দেখতে না পায় তবে ভড়কে যাবে। ভাববে অন্য কেউ তাকে বুকে জড়িয়ে রেখেছে। তখন কি যে কান্ড করবে তার ঠিক নেই। যা রাগী মেয়ে। মজিদ তাই বাবুলের ছবির দিকে চেয়ে নিজের রুপকে বদল করে নেয়। বদলে নেই পোশাকটাও। সেই সাথে ফেরেশতাকেও প্রস্থান করতে বলে। ঘরের ভিতরে আর কারো উপস্থিতি এবার আর কাম্য নয় তার। সব ব্যবস্থা চুড়ান্ত হয়ে গেলে চেয়ার থেকে উঠে টেবিলের পাশে দাড়িয়ে আবারো স্ক্রীনে স্পর্শ করে স্বপ্নের ভুবনে চলে যায় সে।

এবার আর কোনো গন্ডগোল হলো না। কাহিনীর ঘটনাপ্রবাহে কিছু পরিবর্তন অবশ্য হলো। শেষের দৃশ্যে কয়েকদিন পর বাবুলকে দেখার সাথে সাথেই রুপা,

— বাবুল, আমার বাবুল

বলে বাবুলের বুকে ঝাপিয়ে পড়ার সাথে সাথেই বাবুলের মনে পড়ে যায় এই মেয়েটিই তার প্রেমিকা। তাকে সে জান্নাতের ভুবনে নিয়ে যেতে এসেছে। রুপা কান্না থামানোর সাথে সাথে তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে সে বলে,

— রুপা। আমার সাথে যাবে?

রুপা অত্যন্ত শীতল কণ্ঠে বলে

— কোথায়?

বাবুল বলে,

— আকাশের রাজ্যে। সেখানে তুমি চিরকাল আমার বউ হয়ে থাকতে পারবে।

বাবুলের মুখে এমন রোমান্টিক কথা শুনে রুপা হাসে। তারপর ভীষণ আবেগী হয়ে বলে,

— তুমি বললে আমি আকাশ-পাতাল সে কোনো জায়গায় যেতে রাজি আছি।

বাবুল বলে,

— তবে আমাকে শক্ত করে ধরে থাকো। আমি তোমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবো।

রুপা বাবুলকে আরো জোরে চেপে ধরে। সত্যি সত্যি আকাশের রাজ্যে উড়ে যাওয়ার জন্য নয়। প্রেমের মজাকে আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করার জন্য। গভীর আনন্দে দুচোখ বুজে যায় তার। সে জানে বাবুল এতসব বড় বড় কথা আসলে তার মন ভুলানোর জন্য বলছে। দুনিয়ার সকল প্রেমিকই যেমনটি বলে থাকে। তোমার হাতে চাঁদ এনে দেবো, তোমাকে পরীর দেশে নিয়ে যাবো ইত্যাদি কত যে রোমান্টিক কথা তারা বলে তার ইয়ত্তা নেই। আর কথাগুলো নিশ্চিত মিথ্যা জেনেও প্রতিটি মেয়ের মনই তাতে গলে যায়। বাবুলের মুখে আকাশের রাজ্যে যাওয়ার কথা শুনেও রুপার মনে এই একই অবস্থার সৃষ্টি হয়। তখনই বাবুল দু'হাত তুলে বলে,

— হে আল্লাহ আমাদের তুলে নাও।

তৎক্ষনাৎ মজিদ বাস্তবে ফিরে আসে। তার বুকে মাথা রেখে রুপাকে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে আশ্বস্ত হয়। এবার তা হলে কোনো গোলমাল হয়নি। মজিদ এবার রুপার দেহটাকে ঝাঁকি দেয় আর মুখে তার নাম ধরে ডাকে,

— রুপা, এই রুপা।

রুপা চোখ খুলে বাবুলের মুখের দিকে তাকায়। কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করে না সে। সেই বাবুল আর সেই পোশাক-আশাক। পরম তৃপ্তিতে আবারো তার বুকে মাথা রেখে চোখ বুজিয়ে ফেলে সে। বাবুলের প্রতি মমতা যেনো হাজার গুনে বৃদ্ধি পেয়েছে তার অন্তরে। আসলে বাবুল আজ তাকে এমনসব কথা শুনিয়েছে যাতে যে কোনো মেয়ের মন মমতায় গলে যাবে। বলে কিনা, আকাশের রাজ্যে নিয়ে যাবে। কেমন রোমান্টিক কথা!

তখনই মজিদ আরো একবার রুপার দেহটাকে ঝাঁকি মারে,

— এই রুপা। দেখো তোমাকে কোথায় নিয়ে এসেছি।

রুপা এবার চোখ খুলে চারিদিকে তাকায়। সে দেখে পুকুরপাড়, শিমুল গাছ আর ঝোপঝাড়ের বদলে বড় একটা হল রুমে অগনিত চেয়ার-টেবিলের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে সে আর বাবুল। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় সে। ভয়ও পায় কিছুটা। মজিদকে আরো শক্ত করে ধরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে,

— এটা কোন জায়গা?

মজিদ তার কপালে একটা চুমু দিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবে বলে,

— এটা আকাশের রাজ্য। এটা জান্নাত।

রুপা ভীষণ অবাক হয়ে বলে,

— আকাশের রাজ্য? জান্নাত?

তার চোখে মুখে অবিশ্বাসের ভাব-ভঙ্গি স্পষ্ট। তার মনের ভাব বুঝতে পেরে মজিদ বলে,

— বিশ্বাস না হয় নিজের চোখেই দেখবে চলো।

কথাটা বলে, তার হাত ধরে হনহন করে টেনে নিয়ে যায় বাইরের দিকে। যাওয়ার পথে আশে-পাশে রঙ-বেরঙের জিনিস দেখতে দেখতে রুপা যেনো আহ্লাদে আটখানা হয়ে যায়। ধীরে ধীরে তার মজিদের কথায় আস্থা আসে। তার মনে হয় সত্যি সত্যিই সে আকাশের রাজ্যে চলে এসেছে। চিরোকাল বাবুলের বউ হয়ে থাকার জন্য।

বাজার থেকে পোশাক আর অলংকার কিনে মজিদ রুপাকে রাণীর সাজে সাজিয়ে দিলো। মাথায় বসিয়ে দিলো মুকুট। রাখালের বেশ ছেড়ে নিজেও সাজলো আবারও রাজার সাজে। তবে চেহারাটা বাবুলের মতোই রাখলো। কেবল রুপার মন রক্ষা করার জন্য। এক নিমিষে এতকিছু হাতে পেয়ে রুপার তো জ্ঞান হারানোর মতো অবস্থা। রাখালের ছেলে জেনে সে বাবুলকে প্রেম নিবেদন করেছিলো। তার কাছে কিছুই পাওয়ার আশা করেনি কেবল তাকে ছাড়া। আর এখন সে তাকেও পেয়েছে আবার সাথে পেয়েছে দুনিয়ার সব নামী-দামী আর আকর্ষণীয় জিনিস। বাবুলকে সে রাখাল মনে করেছিলো কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সে রাজকুমার। দ্বিগুন আনন্দে রুপার মনটা ফেটে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়। রুপাকে সাথে নিয়ে বাজার থেকে বের হয়েই মজিদ ডাকে,

— পঙ্খীরাজ।

অমনি পঙ্খীরাজ ছুটে এসে তার সামনে দাড়ায়। তাঁকে দেখে রুপা তো অবাক। রুপকথার গল্পে সে পঙ্খীরাজ ঘোড়ার কথা পড়েছে কিন্তু বাস্তবে যে এর অস্তিত্ব থাকতে পারে তা কল্পণাই করেনি কখনও।

— আরে বাস্! এযে, সত্যিকার পঙ্খীরাজ ঘোড়া!

বলে মুক্তাঝরা দাঁতগুলো বের করে হি হি করে হাসতে থাকে রুপা।

কথাটা শুনে পঙ্খীরাজ ভীষণ বিব্রত হয়। সে ভাবে,

— পঙ্খীরাজ ঘোড়া সত্যির হবে না তো কি মিথ্যার হবে!

কিন্তু মুখে কিছুই বলে না। রুপার কথায় প্রতিবাদ করতে সাহস হয় না তার। হাজার হোক মনীবের নতুন বউ। আঘাত দিয়ে কথা বললে, তার উপরই ক্ষেপে যেতে পারে মনীব।

তারপর পঙ্খীরাজ ঘোড়ায় চেপে আকাশে উড়ে যাওয়ার সময় রুপার তো প্রায় পাগল হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা হলো। কখনও মেঘের গায়ে হাত বুলালো কখনও বা বাতাসে দুটি হাত মেলে দিয়ে ওড়নাটা পঙ্খীরাজের দুই পাখার মতোই উড়িয়ে নিলো, আবার কখনও বিকটভাবে চিৎকার করে বলে উঠলো,

— ইয়া হু ..

তার আনন্দ দেখে মজিদের দুটি চোখে পানি চলে আসলো। মনে মনে ভাবলো,

— যত খুশি আনন্দ করুক সে। যে আনন্দ আমাকে দিয়েছে তার বিনিময়ে এটাই তার প্রাপ্য।

তারপর রাজ মহলে পৌঁছে রুপা তো আনন্দে প্রায় গড়াগড়ি দেওয়ার মতো অবস্থা। মজিদ তাকে পরিচয় করিয়ে দিলো তার স্ত্রী আর হুর-পরীদের সাথে। জান্নাতের জীবনের আদলেই গড়ে যায় রুপার মন। হিংসা বিদ্বেষ আর অহংকারের বালাই থাকে না তার দেলে। মজিদের স্ত্রী আর হুর-পরীদের মাঝে একজন হিসেবেই নিজেকে সে ভাগ্যবতী মনে করে। মজিদের প্রেমের কারণেই যে মহান আল্লাহ দয়া করে তাকে অস্তিত্বহীন শূণ্যতার জগত থেকে বাস্তব জগতে নিয়ে এসেছেন আর প্রাণহীন কল্পিত ছায়ামূর্তি থেকে জান্নাতী রাজ্যের রাণীতে পরিণত করেছেন সেটাই তার নিকট পরম পাওয়া। মজিদের নিকট তাই সে চির কৃতজ্ঞ।

পরে তাৎক্ষনিক নির্দেশে রুপার জন্য মজিদ তৈরী করে দিলো আলাদা একটা রাজমহল। অন্যান্য স্ত্রী আর হুর-পরীদের যেমনটি আছে। বহুতল ভবনকে ঘিরে ফুলের বাগান। একপাশে শান বাধানো স্বচ্ছ পানির পুকুরঘাট। প্রধান ফটকের সামনে রয়েছে অতীব সুন্দর ফোয়ারা। নির্মল স্বচ্ছ পানির সাথে সাথেই সেখানে অনবরত বিচ্ছুরিত হচ্ছে আপেল, আঙ্গুর, ডালিম ইত্যাদি রঙ-বেরঙের তাজা-টাটকা ফল। বেশ কিছুদূর উপরে উঠে আবার তা ফিরে যাচ্ছে নিচের দিকে। খোসার উপর বিন্দু বিন্দু পানির ফোটা যেনো তার সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলছে আরও আকর্ষণীয়ভাবে। যে কোনোটির দিকে লক্ষ্য করে হাত বাড়ালেই শাঁ করে সেটা চলে আসছে হাতে। এমন সুন্দর রাজমহল দেখে রুপা ভীষণ কৌতুহলী হয়ে মজিদের দিকে চেয়ে বলল,

— বাবুল, এটা কার বাড়ি?

মজিদ বলল,

— তোমার।

রুপা প্রায় চেঁচিয়ে বলে উঠলো,

— এত বড় বাড়ি শুধুই আমার?

মজিদ বলল,

— না। শুধুই তোমার নয়। তোমার আর আমার। আমাদের দুজনের।

কথাটা শুনে আগের চেয়েও বেশি খুশি হলো রুপা। বাড়িটা শুধুই তার হওয়ার চেয়ে তাদের দুজনের হওয়াটাই তার জন্য অনেক বেশি আনন্দের। ছুটে গিয়ে মজিদকে আলিঙ্গন করে তাকে একটা চুমু দেয় সে। তারপর তার বুকে মাথা রেখে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে ভীষণ আবেগে তাকে জড়িয়ে ধরে বলে,

— এতো বড় রাজা হয়েও তুমি আমার মতো নগণ্য মেয়ের সাথে প্রেম করলে কেনো? কেনই বা আমাকে ঠাঁই দিল তোমার ভুবনে?

মজিদ খুব স্বাভাবিকভাবে বলে,

— তুমি ধনীর দুলালী হয়েও আমার মতো রাখাল ছেলের সাথে প্রেম করেছো বলে।

ভেজা চোখেই মুখে হাসি ফুটিয়ে রুপা আহ্লাদে গদগদ হয়ে বলে,

— আহা! রাখাল ছেলে। তাই বুঝি? তা রাখাল তুমি কিসের? দুনিয়ার সব ছাগল-গরুর নাকি জান্নাতের হুরপরীদের!

কথাটা বলেই হি হি করে হেসে ওঠে সে। তার সাথে তাল মিলিয়ে হাসতে থাকে মজিদ। তার পর থেকে জান্নাতী রাজ্যের স্থায়ী জীবনে মজিদের সাথে সুখে শান্তিতে বাস করতে থাকে রুপা। মাঝে মাঝে দুজনে এক সাথে বাজারে গিয়ে এক সাথে ছবিতে স্পর্শ করে স্বপ্নের ভুবনে গিয়ে প্রেম করে আসে। সেই স্মৃতিকে বুকে ধরে বাস্তব জীবনে ফিরে আসে আবার।

মজিদের জীবনও কাটতে থাকে জান্নাতের হাজারো রকমের সব নাজ-নেয়ামতের মধ্যে। উপভোগ করে যখন যা খুশি। চলচ্চিত্রের হলরুমে গিয়ে প্রেম করে রুপকথার সব

নায়িকাদের সাথে। যাকে মনে ধরে বাস্তবে ফিরিয়ে আনে তাকে। স্থান দেয় জান্নাতী জীবনের হুর-পরীদের ভিড়ে। তারপরে রুপকথার প্রেমিকের সাথে বাস্তব জীবনে অনন্তকাল ধরে চলতে থাকে তাদের সুখের জীবন। তার আসল নাম জানা সত্যেও আদর করে তাদের একেক জন তাকে ডাকে একেক নামে। বাবুল, হিরন, হিসান ইত্যাদি কত যে নাম তার হিসাব নেই। রুপকথার একেক কাহিনীর নায়িকার মুখে ধ্বনিত হয় একেকটি নাম। যে নামে তার সাথে তার প্রথম পরিচয়, প্রথম প্রেম। একেকটি নাম শুনে মজিদের স্মরণ হয়ে যায় একেকটি প্রেমকাহিনী। সেসব একত্রে সংকলিত করলে লেখা হয়ে যাবে কত যে আরব্য রজনী তার হিসেব নেই। সেসব কাহিনী কেবলমাত্র রুপকথার কল্পনা নয় আবার হাজারো লোকের জীবন থেকে সংকলিতও নয়। তার সবই তার নিজের জীবনের। এমন এক জীবনের যা কল্পণা হয়েও বাস্তব। এমন এক নায়িকার সাথে যে বাস্তব জীবনে তার প্রনয় সঙ্গিনী হয়ে রয়েছে চিরকালের জন্য। রুপকথার গল্প গুলো শেষ হয় রুপকথারই মধ্যে। বলা হয়, “তারপর তারা সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগলো”। আর মজিদের কাহিনীগুলোর শেষ তার বাস্তব জীবনে। রুপকথার নায়িকাদের নিয়ে সে তার বাস্তব জীবনেই সুখে শান্তিতে বসবাস করছে। জটিল ব্যাপারই বটে! একেবারে বোধের অগম্য। কিন্তু মহান আল্লাহ বলেন, “তোমার রবের অসাধ্য কিছুই নেই”। [ফাতির/৪৪]

চার

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। এতক্ষণে মুয়াজ্জিন হয়তো মাগরিবের আজান দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে। বই বন্ধ করে ছাগলগুলো খেদিয়ে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হয় মজিদ। রুপা, রুপা করে ডুকরে কেঁদে উঠছে যেনো তার মনটা। রুপার প্রেমে যেনো সে পাগল হয়ে গেছে। লাবণীর কথা মনে পড়ে না আর। ব্যর্থ প্রেমের কথা স্মরণ করে অনর্থক কষ্ট বাড়িয়ে লাভ কি? এখন তাই সে জান্নাতের দুনিয়াতে প্রেম করার স্বপ্ন দেখে। দুনিয়ার সব দুঃখ-কষ্ট আর লোভ লালসাকে ভুলে তাই সে আখিরাতের কাজেই নিজেকে ব্যস্ত রাখে। যাতে পরকালে মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করেন। যেখানে সে গড়ে তুলতে পারবে হুর-পরী আর সুন্দরী নারীদের সাথে মধুর সম্পর্ক। রচনা করতে পারবে রুপকথার মতোই মন মাতানো সব প্রেমকাহিনী।

লেখকের অন্যান্য বই

গবেষণা গ্রন্থঃ

১. আল-ইতকান ফী তাওহীদ আর-রহমান (তাওহীদ সম্পর্কে)
২. আদ-দালালাহ্ আ'লা বিদয়াতে দ্বলালাহ্ (বিদয়াত সম্পর্কে)
৩. ভেজালে মেশাল (গণতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামের রায়)
৪. মাজহাব বনাম আহলে হাদীস
৫. আসবাবুল খিলাফ ওয়াল জাব্বু আনিল মাজাহিবিল আরবায়া (আরবী)
৬. নাফউল ফারীদ ফী জিল্লি বিদাইয়াতিল মুজতাহিদ (উসুলে ফিকহ)
৭. হুসাইন ইবনে মানছুর আল-হাল্লাজ; কথা ও কাহিনী
৮. হরিণ নয়না হুরদের কথা (জান্নাতের স্ত্রীদের বর্ণনা)
৯. আল-ই'লাম বি হুকমিল কিয়াম (কারো সম্মানে দাঁড়ানো বা মীলাদে কিয়াম করার বিধান)
১০. চাঁদ দেখা প্রসঙ্গে
১১. ডাঃ জাকির নায়েক সম্পর্কে কিছু কথা
১২. আত-তাবঈন ফী হুকমিল উমারা ওয়াস সালাতীন
১৩. দরবারী আলেম
১৪. মারেফাত
১৫. লাইলাতুল বারায়াহ্
১৬. হিদায়া কিতাবের অপূর্ব হেদায়েত ('হিদায়া কিতাবের একি হিদায়াত!'' বইয়ের জবাব)
১৭. একটি অসম বিতর্কের সুষম সমাধান
১৮. সাহু সিজদা
১৯. কুরআন, হাদীস ও চার মাযহাবের মতামতের আলোকে সহজ ফারায়েজ
২০. পারিবারিক ভারসাম্য

রিসালাহ (সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ)ঃ

২১. ছোটদের আক্বাইদ
২২. সংক্ষেপে যাকাতের মাসয়ালা মাসায়েল
২৩. তারাবীর সলাতে পারিশ্রমিক গ্রহণের বিধান (আরবী)
২৪. মাসায়িলুল ই'তিকাফ (আরবী)
২৫. সংশয় নিরসন (জিহাদ সম্পর্কিত)

ইসলামী উপন্যাসঃ

২৬. আরব মরুতে শিক্ষা সফর (গণতন্ত্রের স্বরূপ উম্মোচন)
২৭. মৃত্যুদূত (মৃত্যুর ভয়াবহতা ও মৃত্যুর পরের জীবন)
২৮. কল্পিত বিজ্ঞান (বিবর্তবাদ ও নাস্তিকতার খন্ডায়ন)
২৯. পরিবর্তন (নিজের জীবন ও সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প)

৩০. ছোটনের রোজী আপু (কিশোর উপন্যাস)
৩১. সান্টু মামার স্কুল (কিশোর উপন্যাস)
৩২. নাস্তিকতার অসারতা (গল্পের সাহায্যে নাস্তিকদের মতবাদ খন্ডায়ন)
৩৩. বায়াত (কোন বায়াত? কিসের বায়াত?? কার হাতে বায়াত???)
৩৪. কুরানিক চশমা
৩৫. তওবা
৩৬. বিবিজান হুজুরের হারানো বিদ্যা
৩৭. জান্নাতী দুনিয়ার অসম প্রেম

কবিতা গ্রন্থঃ

৩৮. কবিতায় জান্নাত (কবিতার ছন্দে জান্নাতের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা)
৩৯. কল্পনায় জান্নাত (কবিতার ছন্দে জান্নাতের জীবন সম্পর্কে কল্পনা)
৪০. কবিতায় জাহান্নাম (কবিতার ছন্দে জাহান্নামের শাস্তির বিবরণ)
৪১. ভন্ড হুজুর (কবিতার ছন্দে নামধারী আলেমদের ভন্ডামীর বর্ণনা)

ভাষা শিক্ষাঃ

৪২. তাইসীরুল ক্বওয়ায়িদ (আরবী গ্রামার)
৪৩. আরাবিয়্যাতুল আতফাল (ছোটদের আরবী শিক্ষা)